ভারতপথিক রামমোহন রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -প্রণীত জীবনীগ্রন্থ

বুদ্ধদেব

খৃষ্ট

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

বিদ্যাসাগরচরিত

মহাত্মা গান্ধী

চারিত্রপূজা

রামমোহন রায়

জন্ম ১৭৭৪ ?।’ মৃত্যু ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩

ভারতপথিক রামমোহন রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ : রামমোহন-মৃত্যু-শতবার্ষিকী ১৪ পৌষ ১৩৪০

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংস্করণ : ১১ মাঘ ১৩৬৬

পুনর্মুদ্রণ : চৈত্র ১৩৭১

পুনর্মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ : ১৮৯৪ শক

প্রকাশক রণজিৎ রায়

বিশ্বভারতী। ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

মুদ্রক শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী

লয়াল আর্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

১৮৪ লেনিন সরণী। কলিকাতা ১৩

২·১

ভারতপথিক রামমোহন রায়

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো,
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

১৩৪৭

ইতিহাসে দেখি অনেক বড়ো বড়ো প্রাচীন সভ্যতা দেশের নদীর সঙ্গে নাড়ীর যোগে প্রাণবান। নদী দেশকে দেয় জল, দেয় ফল; কিন্তু সব চেয়ে বড়ো তার দান, দেশকে সে দেয় গতি। দূরের সঙ্গে, বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ শাখায়িত করে নদী— স্থাবরের মর্মের মধ্যে নিয়ে আসে প্রাণের চলৎপ্রবাহ।

নদীমাতৃক দেশে নদী যদি একেবারে শুকিয়ে যায় তা হলে তার মাটিতে ঘটে কৃপণতা, তার অন্ন-উৎপাদনের শক্তি ক্ষীণ হয়। দেশের আপন জীবিকা যদি-বা কোনোমতে চলে, কিন্তু যে অন্নপ্রাচুর্যের দ্বারা বাইরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে তার যোগ সেটা যায় দরিদ্র হয়ে। সে না পারে দিতে, না পারে নিতে। নিজের মধ্যে সে রুদ্ধ হয়ে থাকে, বিভক্ত হয় তার ঐক্যধারা, তার আত্মীয়মিলনের পথ হয় দুর্গম। বাহিরের সঙ্গে সে হয় পৃথক, অন্তরের মধ্যে সে হয় খণ্ডিত।

যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমন নিত্য-প্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যেকার ভেদ বিভেদ তার ভেসে যায়— যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।

একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান-মনন-ধারা। সে বলতে পেরেছিল 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা', সকলে আসুক সকল দিক থেকে। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে', শুনুক বিশ্বের লোক। বলেছিল 'বেদাহম্', আমি জানি— এমন কিছু জানি যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ করে জানাবার। যে তারা জ্যোতির্হীন তাকে নিখিল নক্ষত্রলোক স্বীকার করে না। প্রাচীন ভারত নিত্যকালের মধ্যে আপন পরিচয়কে দীপ্যমান করেছে; বিশ্বলোকে সে প্রকাশিত হয়েছে প্রভূত দাক্ষিণ্যে, আপনাকে দান করার দ্বারা। সেদিন সে ছিল না অকিঞ্চনরূপে অকিঞ্চিৎকর।

শত শত বৎসর চলে গেল— ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হল নিস্তব্ধ, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূর-দূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে; তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘ্ন। তেমনি দুর্দিন যখন এল এই দেশে তখন জ্ঞানের চলমান গতি হল অবরুদ্ধ; নির্জীব হল নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি; উদ্ধত হয়ে দেখা দিল নিশ্চল আচারপুঞ্জ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি। সর্বজনের প্রশস্ত রাজপথকে তারা বাধাগ্রস্ত করলে; খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে।

ঘুমের অবস্থায় মনের জানলা যখন সব বন্ধ হয়ে যায়, মন হয় বন্দী। তখন যে-সব স্বপ্ন নিয়ে সে খেলা করে, বিশ্বসত্যের সঙ্গে তাদের যোগ নেই ; কেবলমাত্র সেই সুপ্ত মনের নিজের উপরেই তাদের প্রভাব এক কেন্দ্রে আবর্তিত, তা তারা যতই অদ্ভুত হোক, অসংগত হোক, উৎকট হোক। বাহিরের বাস্তব রাজ্য থেকে এই স্বপ্নরাজ্যে আর কারো প্রবেশের পথ নেই। একে বিদ্রূপ করা যায়, কিন্তু বিচার করা যায় না ; কেননা, এ থাকে যুক্তির বাহিরে।

তেমনি ছিল অর্থহারা আচারের স্বপ্নজালে জড়িত ভারতবর্ষ, তার আলো এসেছিল নিবে। তার আপনার কাছে আপন সত্য-পরিচয় ছিল আচ্ছন্ন। এমন সময় রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হল এই দেশে, সেই আত্মবিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে। সেদিন তার ইতিহাস অগৌরবের কালিমায় আবৃত। ভারত আপন বাণী তখন হারিয়েছে, নিখিল পৃথিবীর এই নতুন কালের জন্যে তার কোনো বার্তা নেই, ঘরের কোণে বসে সে মৃত যুগের মন্ত্র জপ করছে।

যখন সে আপন দুর্বলতায় অভিভূত, সেই অপমানের দিনে বাইরের লোক এল তার দ্বারে ; আপন সম্মান রক্ষা ক'রে তাকে অভ্যর্থনা করবে এমন আয়োজন ছিল না ; অতিথিরূপে তাকে গৃহস্বামী ডাকতে পারে নি, দ্বার ভেঙে দস্যুরূপে সে প্রবেশ করলে তার স্বর্ণভাণ্ডারে।

ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অন্ন নূতন করে উৎপাদন করতে

পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়—বাহ্যবিধির কৃত্রিমতায় কিছুতে তাঁকে তৃপ্ত করতে পারলে না। কোথা থেকে তিনি নিয়ে এলেন সেই জ্ঞানের আগ্রহে স্বভাবত উৎসুক মন, যা সম্প্রদায়ের বিচিত্র বেড়া ভেঙে বেরোল, চারি দিকের মানুষ যা নিয়ে ভুলে আছে তাতে যার বিতৃষ্ণা হল। সে চাইল মোহমুক্ত বুদ্ধির সেই অবারিত আশ্রয়, যেখানে সকল মানুষের মিলনতীর্থ।

এই বেড়া-ভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারতবর্ষের মিলনতীর্থকে উদ্‌ঘাটিত করা। এইজন্যেই এ সাধনা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের যেহেতু এর বিরুদ্ধতাই ভারতে এত প্রভূত, এত প্রবল। ইংলণ্ড ক্ষুদ্র দ্বীপের সীমায় বদ্ধ, সেইজন্যেই তার সাধনা গেছে দ্বৈপায়নতার বিপরীত দিকে, বিশ্বে সে আপনাকে সুদূরে বিস্তার করেছে। দেশের বিশেষ অবস্থার মধ্যেই দেশের অঞ্জলি পাতা রয়েছে; সেই অঞ্জলির অর্থই এই যে, তার শূন্যতাকে পূর্ণ করতে হবে।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আছে তার নিহিতার্থ, তার বিশেষ সমস্যা; সেই অর্থ তাকে পূরণ করতে হয় নিরন্তর প্রয়াসে। এই প্রয়াসের দ্বারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার উদ্‌ভাবনী শক্তি বললাভ করে। মানুষকে তার মনুষ্যত্ব প্রতিক্ষণে জয় করে নিতে হয়। প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আপন জয়যাত্রার ইতিহাস। কঠিন বাধা দূর করবার পথেই তার স্বাস্থ্য, তার

সম্পদ। এইজন্যেই বলেছে— বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। দুর্গমকে সুগম করতে এসেছে মানুষ, দুর্লভকে উপলব্ধ। বিশেষ জাতিকে যে বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন বিধাতা, তার সত্য উত্তর দিতে থাকার মধ্যেই তার পরিত্রাণ। যারা সমাধান করতে ভুল করেছে তারা মরেছে। আর, দুর্গতিগ্রস্ত হয়েছে তারাই যারা মনে করেছে তাদের সমাধান করবার কিছুই নেই, সমস্ত সমাধা হয়ে গেছে। যতক্ষণ মানুষের প্রাণ আছে ততক্ষণই তার সমস্যা, অবিরত সমস্যার উত্তর দিতে থাকাই প্রাণনক্রিয়া। চারি দিকে জড়ের জটিল বাধা নিত্যই, সেই বাধা নিত্যই ভেদ করার দ্বারা প্রাণ আপনাকে সপ্রমাণ করে। ইতিহাসে যে জটা পাকিয়ে থাকে, সেই গ্রন্থিকেই সনাতন ব'লে ভক্তি করলে সেটা মরণের ফাঁস হয়ে ওঠে।

মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায়? যেখানে কোনো অন্ধতায় কোনো মূঢ়তায় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়। মানব-সমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলনা। এই ঐক্যতত্ত্বের উপলব্ধি যেখানেই দুর্বল সেখানে সেই দুর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধ'রে দেশকে চারি দিক থেকে আক্রমণ করে।

ভারতবর্ষে তার সমস্যাটা সুস্পষ্ট। এখানে নানা জাতের লোক একত্রে এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন ঘটে নি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে

বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়। ইতিহাস মাত্রেরই সর্বপ্রধান মন্ত্র হচ্ছে : সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্। এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক ব'লে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দুরূহ এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দুরূহ হোক, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।

অন্য কোনো দেশের শ্রীবৃদ্ধি দেখে যখন আমরা মুগ্ধ হই তখন অনেক সময়ে আমরা তার সিদ্ধির পরিণত রূপটার দিকেই লুব্ধদৃষ্টিপাত করি, তার সাধনার দুর্গম পথটা আমাদের চোখে পড়ে না। দেখতে পাওয়া গেল স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, মনে করি ওই ব্যবস্থার একটি অনুরূপ প্রতিমা খাড়া করতে পারলেই আমাদের উদ্ধার। ভুলে যাই রাষ্ট্রব্যবস্থাটা দেহমাত্র— সেই দেহ নিরর্থক, যদি তার প্রাণ না থাকে। সেই প্রাণই জাতিগত ঐক্য। অন্য দেশে সেই ঐক্যেরই আন্তরিক শক্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সে-সব দেশেও সেই ঐক্যে যেখানে যে পরিমাণ বিকার ঘটে সেখানে সেই পরিমাণেই সমস্যা কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য, পশ্চিম-মহাদেশে শ্রেণীতে শ্রেণীতে। সেই শ্রেণীগত পার্থক্যের মধ্যে আন্তরিক সামঞ্জস্য যদি না ঘটে তা হলে বাহ্য ব্যবস্থায় বিপদ-নিবারণ হবে না।

আমরা যদি কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাই প্রচুর ফসল তা হলে গোড়াতেই এ কথা মনে রাখতে হবে, এ ফসল বালিতে

উৎপন্ন হয় নি, হয়েছে মাটিতে। মরুভূমিতে দেখা যায় উদ্ভিদ দূরে দূরে বিশ্লিষ্ট, তারা কাঁটার দ্বারা নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে রক্ষা করেছে। তাদের জননী ধরণী এক রসের দাক্ষিণ্যে সকলকে পরিপোষণ করে নি, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রাণের ঐক্যে কার্পণ্য। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, মাটির কণায় কণায় বন্ধন আছে, বালির কণায় কণায় বিচ্ছেদ। আমরা যখন সমৃদ্ধিমান জাতির ইতিহাস চর্চা করি তখন ভরা ফসলের দিকে চোখ পড়ে, এবং কৃষিপ্রণালীর বিবরণও যত্ন করে মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে থাকি; কেবল একটা কথা মনে রাখি নে, এই ফসলের ঐশ্বর্য সম্পূর্ণ অসম্ভব যদি তার ভূমিকাতেই থাকে বিচ্ছিন্নতা। কৃষির যত্নকেও আমরা দাবি করি, ফসলেরও প্রত্যাশা করে থাকি, কিন্তু আমাদের ভূমির প্রকৃতিতেই যে বিচ্ছেদ তাকে চোখ বুজে আমরা নগণ্য বলেই জ্ঞান করি এবং ধর্মের নামে তাকে নিত্যরূপে রক্ষা করবার চেষ্টায় সতর্ক হয়ে থাকি। আমরা ইতিহাসের উপরকার মলাটটা পড়ি, ভিতরকার পাতাগুলো বাদ দিয়ে যাই, ভুলে যাই কোনো দেশেই সমাজগত বিশ্লিষ্টতার উপর রাষ্ট্রজাতিগত স্বাতন্ত্র্য আজ পর্যন্ত সংঘটিত ও সংরক্ষিত হয় নি। প্রজারা যেখানে বিভক্ত সেখানে ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্য তাদের বাইরের বন্ধনে বেঁধে রাখে। তাও বেশি দিন টেঁকে না, কেবলই হাতবদল হতে থাকে। যেখানে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ, সেখানে কেবল রাষ্ট্রশক্তি নয়, বুদ্ধিবৃত্তিও শিথিল হয়ে যায়। সেখানে মাঝে

মাঝে প্রতিভাশালীর অভ্যুদয় হয় না তা নয়, কিন্তু সেই প্রতিভার দান ধারণ ও পোষণ করবার উপযুক্ত আধার সর্বসাধারণের মধ্যে না থাকাতে কেবলই তা বিকৃত ও বিলুপ্ত হতে থাকে। ঐক্যের অভাবে মানুষ বর্বর হয়, ঐক্যের শৈথিল্যে মানুষ ব্যর্থ হয়, তার কারণ সমবায়ধর্ম মানুষের সত্যধর্ম— তার শ্রেষ্ঠতার হেতু।

ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কোনো দেশে কোনো শাস্ত্রে হয় নি। ভারতবর্ষেই বলা হয়েছে : বিদ্বান্ ইতি সর্বান্তরস্থঃ স্বসংবিদ্ রূপবিদ্ বিদ্বান্। নিজেরই চৈতন্যকে সর্বজনের অন্তরস্থ ক'রে যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান্। অথচ এই ভারতবর্ষেই অসংখ্য কৃত্রিম অর্থহীন বিধিবিধানের দ্বারা পরস্পরকে যেমন অত্যন্ত পৃথক করে জানা হয়, পৃথিবীতে এমন আর কোনো দেশেই নেই। সুতরাং এ কথা বলতে হবে, ভারতবর্ষে এমন একটা বাহ্য স্থূলতা রয়ে গেছে যা ভারতবর্ষের অন্তরতর সত্যের বিরুদ্ধ, যার মর্মান্তিক আঘাত দীর্ঘকাল ধরে ভারতের ইতিহাসে প্রকাশ পাচ্ছে নানা দুঃখে দারিদ্র্যে অপমানে।

এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন, বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী। এর আগেও নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ঐক্যবাণী। মধ্য-যুগে অচল সংস্কারের পিঞ্জরদ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যুষের

অতন্দ্রিত পাখি, গেয়েছেন তাঁরা আলোকের অভিবন্দন-গান সামাজিক জড়ত্বপুঞ্জের ঊর্ধ্ব আকাশে। তাঁরা সেই মুক্ত প্রাণের বার্তা এনেছেন, উপনিষদ যাকে সম্বোধন করে বলেছেন 'ব্রাত্য-স্ত্বং প্রাণ'— হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য, তুমি সংস্কারে বিজড়িত স্থাবর নও। সেই মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক ব'লে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর-একজন ছিলেন দাদূ। তিনি বলেন—

ভাই রে ঐসা পংথ হমারা
দ্বৈপখরহিত পংথ গহি পূরা অবরণ এক অধারা।

ভাই রে, আমার পথ এইরকম, সে দুইপক্ষরহিত, বর্ণহীন, সে এক।

তিনি বলেছেন—

জাকোঁ মারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি মারৈ,
জাকোঁ তারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি তারৈ।

যাকে আমরা মারি সেই আমাদের ফিরে মারে, যাকে ত্রাণ করি সেই আমাদের ফিরে ত্রাণ করে।

তিনি বলেছেন—

সব ঘট একৈ আতমা, ক্যা হিন্দু মুসলমান।

সেদিন আর-এক সাধু, ভারতের পথ যাঁর কাছে ছিল সুগোচর, তাঁর নাম রজ্জব। তিনি বলেন—

বুংদ বুংদ মিলি রসসিংধ হৈ, জুদা জুদা মরু ভায়।

অর্থাৎ, বিন্দুর সঙ্গে বিন্দু যখন মেলে তখনি হয় রসসিন্ধু, বিন্দুতে বিন্দুতে যখন পৃথক হয়ে যায় তখনি মরুভূমি প্রকাশ পায়।

এই রজ্জব বলেন—

হাথ জোড়ৃ গুরু স্যুঁ হোঁ মিলৈ হিন্দু মুসলমান।

গুরুর কাছে আমি করজোড় করছি যেন হিন্দু মুসলমান মিলে যায়।

এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তি-লাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনসাধনায় নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়। তিনিও প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, মানবাত্মার গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে সেই নিত্য আদর্শের দিক থেকে ভারতের ইতিহাসে শুভবুদ্ধিদ্বারা সংযুক্ত মানুষের এক মহদ্রূপ অন্তরে দেখেছিলেন। ভারতের উদার প্রশস্ত পন্থায় তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন, যে পন্থায় হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে। সেই বিপুল পন্থাই যদি ভারতের না হয়, যদি আচারের কাঁটার বেড়ায় বেষ্টিত সাম্প্রদায়িক শতখণ্ডতাই হয় ভারতের নিত্যপ্রকৃতিগত, তা হলে তো আমাদের বাঁচবার কোনো উপায় নেই। ওই তো এসেছে মুসলমান, ওই তো এসেছে খৃস্টান—

সাধন মাহি জোগ নহি জৈ, ক্যা সাধন পরমাণ।

ঐতিহাসিক সাধনায় এদের যদি যুক্ত করতে না পারি তা হলে সাধনার প্রমাণ হবে কিসে?

এদের অঙ্গীভূত ক'রে নেবার প্রাণশক্তি যদি ভারতের না থাকে, পাথরের মতো কঠিন পিণ্ডীভূত হয়ে এদের বাইরে ঠেকিয়ে রাখাই যদি আমাদের ধর্ম হয়, তবে সেই পুঞ্জ পুঞ্জ অসংশ্লিষ্ট অনাত্মীয়তার নিদারুণ ভার সইবে কে ?

প্রতিদিন কি এরা স্খলিত হয়ে পড়ছে না দলে দলে ? সমাজের নীচের স্তরে কি গর্ত প্রসারিত হচ্ছে না ? আপনার লোক যখন পর হয়ে যায় তখন সে যে নিদারুণ হয়ে ওঠে, তার কি প্রমাণ পাচ্ছি নে ? যাদের অবজ্ঞা করি তাদের আলগা করে রাখি, যাদের ছুঁই নে তাদের ধরতে পারি নে। আপনাকে পর করবার যে সহস্র পথ প্রশস্ত করে রেখেছি, সেই পথ দিয়েই শনির যত চর দেশে প্রবেশ করেছে। আমাদের বিপুল জন-তরণীর তক্তাগুলিকে সাবধানে ফাঁক ফাঁক ক'রে রাখাকেই যদি ভারতের চিরকালীন ধর্ম ব'লে গণ্য করি, তা হলে বাইরের তরঙ্গগুলোকে শত্রু ঘোষণা ক'রে কেন মিছে বিলাপ করা ? তা হলে বিনাশের লবণাশ্রুসমুদ্রে তলিয়ে যাওয়াকেই ভারত-ইতিহাসের চরম লক্ষ্য ব'লে নিশ্চেষ্ট থাকাই শ্রেয়। সেচনী দিয়ে ক্রমাগত জল সেঁচে সেঁচে কতদিন চলবে আমাদের জীর্ণ ভাগ্যের তরী বাওয়া ?

আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভকালেই এসেছেন রামমোহন রায়। তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারে নি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন এ যুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান।

তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার ক'রে দেখিয়েছিলেন সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কারো স্থান-সংকীর্ণতা নেই। তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে, যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে, স্বীকৃতি আছে।

সকল দেশেরই মধ্যে একটা বিরুদ্ধতার দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এক ভাগে তার আপন শ্রেষ্ঠতাকে আপনি প্রতিবাদ, তার অন্ধতা অহমিকা -দ্বারাই তার আত্মলাঘব; এই দিকটা অভাবার্থক, এই দিকে তার ক্ষতির বিভাগ, তার কৃষ্ণপক্ষের অংশ। আর-এক দিকে তার আলোক, তার নিহিতার্থ, তার চিরসত্য; এই দিকটাই ভাবার্থক, প্রকাশাত্মক। এই দিকে তার পরিচয় যদি ম্লান না হয়, নিঃশেষিত না হয়, তবেই সর্বকালে সে গৌরবান্বিত।

য়ুরোপের সকল দেশেই একদিন ডাইনির অস্তিত্ব বিশ্বাস করত। শত শত স্ত্রীলোক সেখানে নিরপরাধে পুড়ে মরেছে। কিন্তু এই অন্ধতার দিকটাই আন্তরিকভাবে য়ুরোপের একান্ত ছিল না। তাই লোকগণনায় এই বিশ্বাসের প্রসার পরিমাপ ক'রে এর দ্বারা য়ুরোপকে চিনতে গেলে অবিচার হবে। একদিন য়ুরোপের ধর্মমূঢ়বুদ্ধি জিয়োর্ডানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল, কিন্তু সেদিন চিতায় জ্বলতে জ্বলতে একলা জিয়োর্ডানো দিয়েছিলেন য়ুরোপীয় চিত্তের পরিচয়, যে চিত্তকে সে যুগের

সাম্প্রদায়িক জড়বুদ্ধি দল বেঁধে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু যাকে আজ সর্বমানব সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে। একদিন ইংরেজের সাহিত্যে, তার ইতিহাসে, ইংরেজের পরিচয় আমরা পেয়েছিলুম; দেখেছিলুম মানুষের প্রতি তার মৈত্রী, দাসপ্রথার 'পরে তার ঘৃণা, পরাধীনের মুক্তির জন্যে তার অনুকম্পা, ন্যায়বিচারের প্রতি তার নিষ্ঠা। আজ যদি ভারতের রাষ্ট্রাসন জুড়ে তার এই স্বভাবের নিষ্ঠুর প্রতিবাদ অজস্র দেখতে পাই, তবু তার থেকে ইংরেজের চরম পরিচয় গ্রহণ করা সত্য হবে না। যে কারণেই হোক তার অভাবার্থক দিকটা প্রবল হয়ে উঠেছে, এ-সমস্ত তারই দুর্লক্ষণ। আজও ইংলণ্ডে এমন মানুষ আছে ইংরেজ-স্বভাবের বিরুদ্ধগামী সমস্ত অন্যায় যাদের হৃদয়কে পীড়িত করছে। বস্তুত সব ইংরেজই যে ইংরেজ এ কথাটা মনে করাই ভুল। খাঁটি ইংরেজের সংখ্যা স্বল্প যদি-বা হয়, আর নিজের সমাজে তারা যদি-বা লাঞ্ছনা ভোগ করে, তবুও তারা সমস্ত ইংরেজেরই প্রতিনিধি।

তেমনি একদা যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হল, সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন। তাঁর সর্বতোমুখী বুদ্ধি ও সর্বতঃপ্রসারিত হৃদয় সেদিনকার এই বাংলাদেশের অখ্যাত কোণে দাঁড়িয়ে সকল মানুষের জন্যে আসন পেতে দিয়েছিল। এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলবার দিন এসেছে যে, যে আতিথ্যভ্রষ্ট আসন কৃপণঘরের রুদ্ধ

কোণের জন্য সে আসন নয়, যে আসনে সর্বজন অবাধে স্থান পেতে পারে সেই উদার আসনই চিরন্তন ভারতবর্ষের স্বরচিত। লক্ষ লক্ষ আচারবাদী তাকে যদি সংকুচিত করে, খণ্ড খণ্ড করে, সমস্ত পৃথিবীর কাছে স্বদেশকে ধিক্কৃত ক'রে ভারত-সভ্যতার প্রতিবাদ করে, তবু বলব এ কথা সত্য। মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল— তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খৃস্টানকে, ভারতের সর্বজনকে হিন্দুর এক পঙ্‌ক্তিতে ভারতের মহা অতিথিশালায়। যে ভারত বলেছে—

> যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
> সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সকলের মধ্যে আপনাকে, আপনার মধ্যে সকলকে দেখেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না।

তাঁর মৃত্যুর পরে আজ একশত বৎসর অতীত হল। সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে, কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেননা, তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীতকালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই— তার অন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের

সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খৃস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়। বায়ুপোতে অত্যূর্ধ্ব আকাশে যখন ওঠা যায় তখন দৃষ্টিচক্র যতদূর প্রসারিত হয়, তার এক দিকে থাকে যে দেশকে বহুদূরে অতিক্রম করে এসেছি, আর-এক দিক থাকে সম্মুখে যা এখনো আছে বহুযোজন দূরে। রামমোহন যে কালে বিরাজ করেন সে কাল তেমনি অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।

আজ আমার অধিক বলবার শক্তি নেই; কেবল এই কথা মাত্র বলতে এসেছি যে, যদিও অজ্ঞানের অশক্তির জগদ্দল পাথর ভারতের বুকে চেপে আছে, লজ্জায় আমরা সংকুচিত, দুঃখে আমাদের দেহমন জীর্ণ, অপমানে আমাদের মাথা অবনত, বিদেশের পথিক আমাদের কলঙ্ক কুড়িয়ে নিয়ে দেশে দেশে নিন্দাপণ্যের ব্যাবসা চালাচ্ছে, তবু আমাদের সকল দুর্গতির উপরে সর্বোচ্চ আশার কথা এই যে, রামমোহন রায় এ দেশে জন্মেছেন, তাঁর মধ্যে ভারতের পরিচয়। তাঁকে দেশের বহুজনে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র অহমিকায় যদি অবজ্ঞা করে, আপন বলে স্বীকার না করে, তবুও চিরকালের ভারতবর্ষ তাঁকে গভীর অন্তরে নিশ্চিত স্বীকার করেছে। বর্তমান যুগ -রচনায় আজও

তাঁর প্রভাব ক্রিয়াশালী, আজও তাঁর নীরব কণ্ঠ ভারতের অমর বাণীতে আহ্বান করছে তাঁকে—

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ।

প্রার্থনা করছে—

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

১৪ পৌষ ১৩৪০

হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।
মৃত্যু অন্তরাল ভেদি' দাও তব অন্তহীন দান
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব।

রবীন্দ্রনাথ

২

আমাদের প্রাণ বিদ্রোহী। চার দিকে জড়দানব তার প্রকাণ্ড শক্তি ও অসংখ্য বাহু বিস্তার করে বসে আছে। ক্ষুদ্র প্রাণ প্রতি মুহূর্তে নানা দিক থেকে তাকে নিরস্ত করে তবে আত্ম-প্রকাশ করে। এই জড় তার চারি দিকে ক্লান্তির প্রাচীর তুলে তুলে তার প্রয়াসের পরিধিকে কেবলই সংকীর্ণ করে আনতে চায়। বারংবার এই প্রাচীরকে ভেঙে ভেঙে তবে প্রাণ আপন অধিকার রক্ষা করতে পারে। তাই আমাদের হৃৎপিণ্ড দিনে রাত্রে এক মুহূর্ত ছুটি নিতে পারে না, গুরুভার বস্তুপুঞ্জের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তার আক্রমণ ক্ষান্ত হলেই মৃত্যু।

প্রাণের এই নিত্য সচেষ্টতাতেই যেমন প্রাণের আত্মপ্রকাশ, মনেরও তাই। তার অনন্ত জিজ্ঞাসা। চার দিকে সত্যের রহস্য মূক হয়ে আছে। আপন শক্তিতে উত্তর আদায় করতে হয়। অল্প অনবধান হলেই ভুল উত্তর পাই। সেই ভুল উত্তরগুলিকে নিশ্চেষ্ট নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিলেই মনের সাংঘাতিক পরাভব। জিজ্ঞাসার শৈথিল্যেই মনের জড়তা। যেমন জীবনী-শক্তির নিরুদ্যমেই অস্বাস্থ্য, তাতেই যত রোগের উৎপত্তি, বিনাশের আয়োজন, তেমনি মননশক্তির অবসাদ ঘটলেই মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে যত রকমের বিকার প্রবেশ করে। সত্যমিথ্যা ভালোমন্দ সমস্ত-কিছুকেই বিনাপ্রশ্নে অলস ভীরু মন যখন মেনে নিতে থাকে, তখনি মনুষ্যত্বের সকল প্রকার দুর্গতি।

জড়ের মধ্যে যে অচল মূঢ়তা, মানুষের মন যখনি তার সঙ্গে আপসে সন্ধি করে তখন থেকে জগতে মানুষ মন-মরা হয়ে থাকে, জড় রাজার খাজনা জুগিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে একদিন মনের স্বরাজ গিয়েছে ধ্বংস হয়ে। পঙ্গু মনের ছিল না আত্মকর্তৃত্ব, প্রশ্ন করবার শক্তি ও ভরসা সে হারিয়েছিল। সে যা শুনেছে তাই মেনেছে, যে বুলি তার কানে দেওয়া হয়েছে সেই বুলিই সে আউড়িয়েছে। যখন কোনো উৎপাত এসে পড়েছে স্কন্ধে তখন তাকে বিধিলিপি বলে নিয়েছে মেনে। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নূতন প্রণালীতে বর্তমানকালীন সংসারসমস্যার সমাধান করা তার অধিকার-বহির্ভূত বলে স্বীকার করার দ্বারা আত্মাবমাননায় তার সংকোচ ছিল না। মনের আত্মপ্রকাশের ধারা সেদিন এ দেশে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেশ তখন সামনের কালের দিকে চলে নি, পিছনের কালকেই ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করেছে—চিন্তা-শক্তি যেটুকু বাকি ছিল সে অনুসন্ধান করতে নয়, অনুসরণ করবার জন্যেই।

সুপ্তি যখন আবিষ্ট করে তখনি চুরি যাবার সময়। অন্তরের মধ্যে যখন অসাড়তা, বাইরের বিপদ তখনি প্রবল। চিত্তের মধ্যে যার স্বাধীনতা নেই বাইরের দিক থেকে সে কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। অন্তরের দিকে সব-কিছুকে যে অবিসম্বাদে মেনে নেয়, বাইরে অন্যায় প্রভুত্বকেও না মানবার শক্তি তার থাকে না— যে বুদ্ধি অসত্যকে ঠেকায় মনে, সেই

বুদ্ধিই অমঙ্গলকে ঠেকায় বহিঃসংসারে— নির্জীব মন অন্তরে বাহিরে কোনো আক্রমণকেই ঠেকাতে পারে না। তাই সেদিনকার ভারতের ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেল ভারতবর্ষ তার মর্মান্তিক পরাভবকে মেনে নিলে আর সেইসঙ্গে মেনে নিলে যা না-মানবার এমন হাজার হাজার জিনিস। এই-যে তার বাইরের দুর্দশার বোঝা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল, এ তার অন্তরের অবুদ্ধির বোঝারই শামিল।

যখন আমাদের আর্থিক মানসিক আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃষ্টিশক্তি আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এ দেশে আবির্ভাব। প্রবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই দুরবস্থার মূলে, যা মানুষের পরম সম্পদ স্বাধীনবুদ্ধিকে অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু, তখন আমরা সেই দুরবস্থার কারণকেই পূজা করতে অভ্যস্ত, তাই সেদিন আমরাও তাঁকে শত্রু বলে দণ্ড উদ্যত করেছি। ডাক্তার বলেন— রোগ জিনিসটা দেহের অধিকার সম্বন্ধে দীর্ঘকালের দলিল দাখিল করলেও সে বাহিরের আগন্তুক, স্বাস্থ্যতত্ত্বই দেহের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য। রামমোহন রায় তেমনি করেই বলেছিলেন আমাদের অজ্ঞানকে, আমাদের অন্ধতাকে কালের গণনায় সনাতন বলি, কিন্তু সত্যের দিক থেকে তাই আমাদের অনাত্মীয়

আগন্তুক। তিনি দেখিয়েছিলেন আমাদের দেশের অন্তরাত্মার মধ্যেই কোথায় আছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চিরপুরাতন চিরনূতন প্রতিষ্ঠা; মনের স্বাস্থ্যকে আত্মার শক্তিকে প্রবল করবার জন্যে, উজ্জ্বল করবার জন্যে, ভারতের একান্ত আপন যে সাধনসম্পদের ভাণ্ডার তারই দ্বার তিনি খুলে দিয়েছিলেন। সেদিনকার জনতা তাঁকে শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল।

আজও কি রামমোহনকে আমরা শত্রু বলে অসম্মান করতে পারি? যার গৌরবে দেশ বিশ্বের কাছে আপন গৌরবের পরিচয় দিতে পারে, এমন লোক কি আমাদের অনেক আছে? দেশের যথার্থ মহাপুরুষের নামে গৌরব করার অর্থই দেশের ভবিষ্যতের জন্যে আশা করা। সে গৌরব প্রাদেশিক হলে, সাময়িক হলে, তার উপরে নির্ভর করা চলে না। সে গৌরব এমন হওয়া চাই সমস্ত পৃথিবী যার সমর্থন করে। রামমোহনের চিত্ত, তাঁর হৃদয়, স্থানিক ও ক্ষণিক পরিধিতে বদ্ধ ছিল না। যদি থাকত তবে দেশের সাধারণ লোকে অনায়াসে তাঁকে সমাদর করতে পারত। কারণ, যে মানদণ্ড আমাদের নিত্য ব্যবহারের দ্বারা সুপরিচিত তা বিশেষ দেশ-কালের, তা সর্বদেশ ও চিরন্তন কালের নয়। কিন্তু, সেই পরিমাপের দ্বারা পরিমিত গৌরবের জোরে দেশ মাথা তুলতে পাববে না, সর্বদেশকালের সর্বলোকের কাছে তাকে আত্মপ্রকাশ করাতে পারবে না। তার মহত্ত্বকে নিম্নভূমিবর্তী জনতার আদর্শকে অনেক উপরে ছাড়িয়ে উঠতে হবে। তাতে ক'রে বর্তমান-

কালের সাম্প্রতিক রুচি বিশ্বাস ও আচার তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো আঘাত চিরন্তন আদর্শে আঘাত। দিঙ্‌নাগাচার্যের স্থূলহস্তের আঘাত উপস্থিতের আঘাত, সেই উপস্থিত মুহূর্ত নিজেই সদ্যোধ্বংসোন্মুখ, কিন্তু ভারতীর সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের আঘাত শাশ্বত কালের। সে আঘাতে যারা বিলুপ্ত হয়েছে তাদের সমসাময়িক জয়ধ্বনির তারস্বর মহাকালের মহাকাশে ক্ষীণতম স্পন্দনও রাখে নি।

ক্ষণিক অনাদরের তুফানে যাদের নাম তলিয়ে যায় রামমোহন রায় তো সেই শ্রেণীর লোক নন। বিস্মৃতি বা উপেক্ষার কুহেলিকা তাঁর স্মৃতিকে কিছুকালের জন্য আচ্ছন্ন রাখলেও সে আবরণ কেটে যাবেই। দেশে আজ নবজাগরণের হাওয়া যখন দিয়েছে, সরে যাচ্ছে বাষ্পের অন্তরাল, তখন সর্বপ্রথমেই দেখা যাবে রামমোহনের মহোচ্চ মূর্তি। নবযুগের উদ্‌বোধনের বাণী দেশের মধ্যে তিনিই তো প্রথম এনেছিলেন, সেই বাণী এই দেশেরই পুরাতন মন্ত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল; সেই মন্ত্রে তিনি বলেছিলেন— 'অপাবৃণু', হে সত্য, তোমার আবরণ অপাবৃত করো। ভারতের এই বাণী কেবল স্বদেশের জন্যে নয়, সকল দেশের সকল কালের জন্যে। এই কারণেই ভারতবর্ষের সত্য যিনি প্রকাশ করবেন তাঁরই প্রকাশের ক্ষেত্র সর্বজনীন। রামমোহন রায় সেই সর্বকালের মানুষ। আমরা গর্ব করতে পারি স্থানিক ও সাময়িক ক্ষুদ্র মাপের বড়লোককে নিয়ে, কিন্তু যাঁদের নিয়ে গৌরব করতে পারি তাঁরা 'পূর্বাপরৌ

তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ'। তাঁদের মহিমা পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রকে স্পর্শ করে আছে।

ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের যাঁরা পূর্ববর্তী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবীর নিজেকে বলেছিলেন ভারতপথিক। ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মহাপথরূপে। এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান মানবের ধারা প্রবাহিত। এই পথে স্মরণাতীত কালে এসেছিল যারা, তাদের চিহ্ন ভূগর্ভে। এই পথে এসেছিল হোমাগ্নি বহন করে আর্যজাতি। এই পথে একদা এসেছিল মুক্তিতত্ত্বের আশায় চীনদেশ থেকে তীর্থযাত্রী। আবার কেউ এসেছে সাম্রাজ্যের লোভে, কেউ এল অর্থকামনায়। সবাই পেয়েছে আতিথ্য। এ ভারতে পথের সাধনা পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যাওয়া-আসার নেওয়া-দেওয়ার সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমস্যা সমাধান করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। এই মিলনের সত্য সমস্ত মানুষের চরম সত্য, এই সত্যকে আমাদের ইতিহাসে অঙ্গীভূত করতে হবে। রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক— সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্তায়, সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের মহা ঐক্যতত্ত্ব 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্'। আধুনিক যুগে মানবের ঐক্যবাণী যিনি বহন করে

এনেছেন, তাঁরই প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ভারতের আধুনিক কবি ভারতপথের যে গান গেয়েছে তাই উদ্‌ধৃত করে রামমোহনের প্রশস্তি শেষ করি—

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।...

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহাওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

১৬ পৌষ ১৩৪০

৩

আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক প্রতিকূল লোকমত প্রায়ই অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দেয়— ব্যক্তিগত কটুভাষণের সঙ্গে বিজড়িত হওয়াতে সেই তীব্রতার সামনে দাঁড়িয়ে আপন মত প্রকাশ করা সংকোচের বিষয় হয়ে ওঠে। আজ আমার পক্ষে সেই সংকোচের দিনের অবসান হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে আমি মৃত্যুর গহনে অবতরণ করেছিলুম, এখনো তার বন্ধুর তটভাগে স্খলিত পদে চলেছি। আজ আমার পক্ষে লোকমতের প্রভাব আর প্রবল নয়— এখন নিরবধিকাল আমার সম্মুখে বর্তমান।

১১ই মাঘের উৎসব যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাকে আমাদের দেশের জনসাধারণ স্বীকার করে নি। যা তারা স্বীকার করে না তাকে তারা কলঙ্কিত করে। যিনি পরম শ্রদ্ধেয়, যেমন মহাত্মা রামমোহন রায়, তাঁর সম্বন্ধে বিরোধের উত্তাপ আজও প্রশমিত হয় নি। এটা স্বাভাবিক, সুতরাং অনিবার্য, অতএব তাই নিয়ে পরস্পরকে লাঞ্ছিত করা নিরর্থক। এ-সকল দ্বন্দ্বকোলাহল ভুলে গিয়ে, অদ্যকার উৎসবের মূলে যাঁর মহান্ চারিত্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত, শান্তমনে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশে আমাদের ভক্তি নিবেদন করব। মতভেদ সত্ত্বেও এই শ্রদ্ধার কারণকে সত্য বলে স্বীকার করবেন এ কথা আমাদের দেশের সকলের কাছেই প্রত্যাশা করতে পারি। কারণ, এই সম্মানে স্বদেশেরই প্রতিই সম্মান।

পরজাতীয়কে যখন আমরা আচার ধর্ম নিয়ে বিচার করি তখন স্বভাবত অত্যুক্তি করে থাকি, বিশেষত যেখানে তাদের সঙ্গে এমন সম্বন্ধ যা দুঃখ দেয় এবং অপমান করে। কিন্তু তাদের ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মহত্ত্ব প্রকাশ করে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশেও সামাজিক শত বাধা ভেদ করে মহাপুরুষের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু সংস্কারের আবিলতায় আমরা তাঁদের ক্ষুদ্র করেছি, তাঁদের সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি নি। জাতীয় চিত্তদৈন্যের এই বিকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রত্যহ আমাদের ইতিহাসে।

খৃস্টধর্ম মানুষকে শ্রদ্ধা করেছে, কেননা, তাঁদের যিনি পূজনীয় তিনি মানবের রূপে মানবের ভাগ্য স্বীকার করেছিলেন। এই কারণে যাঁরা যথার্থ খৃস্টান তাঁদের মানবপ্রীতি অকৃত্রিম-ভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে দেশে বিদেশে, আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। যদি তাঁদের ধর্মমতে কোনো অসম্পূর্ণতা থাকে ব'লে আমরা মনে করি, তবু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, অন্তত এক জায়গায় এই ধর্ম মানবজাতির সঙ্গে আত্মনিবেদনের যোগে তাঁদের সম্বন্ধযুক্ত করতে পেরেছে, সেটা ধর্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁদের সাহিত্য এবং ব্যবহারে যেখানে মাহাত্ম্য দেখেছি মানবিকতা সেখানে সমুজ্জ্বল। সেখানে দৈন্য নেই, সেখানে স্বার্থের সংঘাতের ঊর্ধ্বে একটি উদার সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। আমাদের দেশে ধর্ম মানুষের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে; আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বাহন না

হয়ে আধুনিক ভারতীয় ধর্মানুষ্ঠান দেশব্যাপী ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করেছে।

আচার যেখানে সাম্প্রদায়িক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয়, সেখানে তাই নিয়ে মানুষের পরস্পর অনৈক্য ঘটে না। যেমন চীন-দেশে। চীন-সভ্যতায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিরোধ নেই মতের পার্থক্য সত্ত্বেও। আচারে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধর্মের নামে সমাজকে তারা নিপীড়িত করে নি। যখন এক সময়ে খৃস্টধর্ম ঈশ্বরের ক্রোধের দোহাই দিয়ে বাহুবলে নিজের প্রভুত্ববিস্তার-চেষ্টা করেছিল তখনি সে ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্যাতন করেছে, কেননা, তখনো তাদের ধর্ম শুভবুদ্ধিকে অমান্য ক'রে সংস্কারকেই স্বীকার করেছিল। সর্বসাধারণের বিশ্বাসের কোনো বুদ্ধিসম্মত ভূমিকা তাতে দেখা দেয় নি শাস্ত্র-অনুশাসন ছাড়া। আজকের দিনে য়ুরোপীয় সভ্যতার বহু ত্রুটি সত্ত্বেও সমাজে ধর্মের অন্ধ আক্রমণ নেই, তাদের মধ্যে কেউ বৌদ্ধ বা মুসলমান হলে তাকে ধর্মের নাম নিয়ে অত্যাচার করা হয় না। আচার এবং ধর্মের মিশ্রণে তাদের সমাজ কলুষিত হয় নি—তাদের শক্তির একটি কারণ সেইখানে। আমাদের দেশে শক্তিক্ষয়ের প্রধান একটা হেতু— ধর্মের নাম নিয়ে প্রাত্যহিক জীবনে বহু নিরর্থক সংস্কারের আধিপত্য। এতে ধর্মের ভ্রষ্টতা এবং আচারের অত্যাচারপরায়ণ অন্যায়রূপ প্রকাশ পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে দক্ষিণ-মালাবারের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনো ব্রাহ্মণেতর-জাতীয় ডাক্তারকে ব্রাহ্মণ গৃহস্থ

আপন বাড়িতে নিয়েছিল চিকিৎসার জন্য, যে পথ দিয়ে গিয়েছিল সেটা কোনো পুষ্করিণীর তীরস্থ। তাতে মকদ্দমা উঠেছিল আদালত পর্যন্ত যে, সমস্ত পুষ্করিণীর জল দূষিত হয়েছে, অতএব তাকে শোধন করবার আইন জারি হোক অপরাধী গৃহস্থের উপর। এখানে দেখি দণ্ডদাতা আইন এবং আচারের সমবেত মূঢ় আক্রমণ, এর মধ্যে শাশ্বত ধর্মের পরিচয় নেই। অথচ ধর্মের নামে এইরকম অমানবিকতা আমাদের দেশে শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে। মহাপুরুষ দৈবে আমাদের মধ্যে জন্ম-গ্রহণ ক'রে এই অধার্মিক ধর্মবিশ্বাস এবং বুদ্ধিবিরোধী আচারের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তথাপি দেশের জনসাধারণের মধ্যে নিরর্থক অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তিই ধর্মের মর্যাদা নিয়েছে এবং আজও ধর্মবোধহীন অমানবিকতার চাপে সমাজ মানুষকে অপমানিত করছে।

এইপ্রকার মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের অভিঘাতে সমাজ শতখণ্ডে ভেঙে পড়ল— তার নাম নিয়ে বেশির ভাগ দেশবাসীকে অবজ্ঞাভাজন করা হল, বলা হল অশুচি এবং অপাঙক্তেয়। আচারের বেড়া গেঁথে যে বহুসংখ্যক মানুষকে দূরে সরিয়েছি তাদের দুর্বলতা এবং মূঢ়তা, তাদের আত্মাবমাননা সমগ্র দেশের উপর চেপে তাকে অকৃতার্থ করে রেখেছে সুদীর্ঘকাল। অথচ আমাদের যা বিশুদ্ধ, যা আমাদের সনাতন আধ্যাত্মিক সম্পদ, তাতে মানুষের এবং সর্বজীবের মূল্য ভূরিপরিমাণ স্বীকার করেছে। আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি —এত বড়ো

কথা বোধ হয় কোনো শাস্ত্রে নেই। সকলের মধ্যে আত্মার এই সম্বন্ধস্বীকার এবং এই সমগ্রের দৃষ্টিকে আমরা হারিয়েছি। আনুষ্ঠানিক মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ঘরে ঘরে আচারের এবং অনৈক্যের ব্যর্থতা বিস্তার করেছি। জাতীয় সত্তা শতধা বিখণ্ডিত হয়ে আজ আমাদের চরম দুরবস্থা উপস্থিত। এই দুর্গতিগ্রস্ত সমাজে একদিন একটি ব্রাহ্মণসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন— রামমোহন রায়। সমাজের সমস্ত অন্ধতাকে তিনি প্রতি পদে অস্বীকার করেছেন, নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছেন মূঢ় সংস্কারের বিরুদ্ধে। সেজন্যে তিনি নিন্দাভাজন হয়েছেন এবং সেই নিন্দার আক্রমণ এখনো শান্ত হয় নি। এই দুর্গতির দিনেই আজ আমাদের পুনর্বার তাঁর বাণী স্মরণ করবার সময় এল। তাঁর মহাজীবনের মূল সাধনা কোন্‌খানে নিহিত তা আমাদের বুঝতে হবে।

উপনিষদের একটি মন্ত্র আছে— সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। বিশ্ববিধাতার একটা রূপ আছে যা কেবলমাত্র সত্য, অর্থাৎ আছে ছাড়া তার অন্য বাণী নেই। তার পরবর্তী কথা হচ্ছে জ্ঞানং— সে কেবলমাত্র হওয়া নয়। সত্যবোধের উপরে জ্ঞানের উপলব্ধিতে মনুষ্যত্বের বড়ো পদবী লাভ হল। সেই জ্ঞানকে যেখানে অবজ্ঞা করা হয়েছে, বুদ্ধির মোহমুক্ত বহুধা শক্তিকে প্রয়োগ না ক'রে মানবত্বকে যেখানে অস্বীকার করেছি, সেইখানে আমাদের অকৃতার্থতা। জ্ঞানের সোপান দিয়ে উপনীত হই পরমাত্মায়, কৃত্রিম কর্মের পথে নয়। তাঁর সামীপ্যে সর্বমানবের মিলন। ব্রহ্মকে উপনিষদ-কথিত বাণীতে উপলব্ধি

করতে হলে বিশ্বসত্যকে স্বীকার ক'রে জ্ঞানের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক সত্যে পৌঁছতে হবে।

সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥

সর্বব্যাপী আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সকলের মধ্যে জ্ঞানতৃপ্ত ঋষিরা প্রবেশ করেন। আমাদের শাস্ত্রমতে এই হচ্ছে মানুষের চরম সার্থকতা। এই বাণী ফিরিয়ে আনলেন মহাত্মা রামমোহন রায়। আনুষ্ঠানিক কৃত্যের বন্ধনে বন্দী সমাজকে ধর্মভ্রষ্টতা হতে আত্মোপলব্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত করলেন তিনি; ভারতকে শোনালেন ঐক্যমন্ত্র, যাতে চরম মানবসত্যের উপলব্ধি -দ্বারা মানুষের মধ্যে সত্য এবং জ্ঞানের যোগে কল্যাণময় সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। ধর্মের বিকার ভয়াবহ; বৈষয়িক ঈর্ষা-বিরোধে যে ক্ষতি করে তারও চেয়ে সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে ধার্মিকতা। আশ্চর্য ধীশক্তি নিয়ে রামমোহন দাঁড়ালেন জাতীয় ধর্মবিশ্বাসের কুহেলিকার অতীতে, সত্যের অকুণ্ঠিত প্রকাশে নিয়োগ করলেন তাঁর অতুলনীয় চারিত্রশক্তি। এই অধ্যবসায়ে তিনি ছিলেন একক, তিনি ছিলেন নিন্দিত। তাঁর সাধনাকে আজকের এই উৎসবে অন্তরে গ্রহণ করে নিজেকে এবং নিজের দেশকে যেন ধন্য করি।

মাঘ ১৩৪৭

৪

ভারতবর্ষের ভূ-সংস্থানের মধ্যে একটি ঐক্য আছে। এর উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্রের বেষ্টন, পূর্ব দিকে গভীর অরণ্য, কেবল পশ্চিমে দুর্গম গিরিসংকটের পথ। ভৌগোলিক আকৃতির দিক থেকে তার অখণ্ডতা, কিন্তু লোকবসতির দিক থেকে সে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। আচারে বিচারে ধর্মে ভাষায় ভারতবর্ষ পদে পদে খণ্ডিত। এখানে যারা পাশাপাশি আছে তারা মিলতে চায় না। এই দুর্বলতা-দ্বারা ভারতবর্ষ ভারাক্রান্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম।

আর-একটি দুর্গতি স্থায়ী হয়ে এ দেশকে জীর্ণ করেছে। অশথগাছ পুরাতন মন্দিরকে সর্বাঙ্গে বিদীর্ণ করে তাকে শিকড়ে শিকড়ে যেমন আঁকড়ে থাকে, তেমনি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের মূঢ়সংস্কারজাল দেশের চিত্তকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে জড়িয়ে রয়েছে। আগাছার মতো অন্ধসংস্কারের একটা জোর আছে; তার জন্য চাষ-আবাদের প্রয়োজন হয় না, আপনি বেড়ে ওঠে, মরতে চায় না। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানের ও ধর্মের উৎকর্ষের জন্য নিরন্তর সাধনা চাই। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে যেখানে উদার ক্ষেত্রে ফল ফলতে পারত সেখানে সর্বপ্রকার মুক্তির অন্তরায় উত্তুঙ্গ হয়ে উঠে অস্বাস্থ্যকর নিবিড় জঙ্গল হয়ে আছে। এমন-কি, এ দেশে যাঁরা বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁদেরও বহু লোকের মন গূঢ়ভাবে আফিমের নেশার মতো তামসিকতার দ্বারা অভিভূত। এর সঙ্গে লড়াই করা দুঃসাধ্য।

আর্যজাতি যাদের একদিন পরাজিত করেছিলেন, অবশেষে তাদেরই প্রকৃতি জয়ী হয়েছে। সমস্ত দেশ জুড়ে ঘটিয়ে তুলেছে মারাত্মক আত্মবিচ্ছেদ। পরস্পরকে অবজ্ঞা করা এবং পাশ কাটিয়ে চলার যে দুর্ব্যবহার তা এই দেশের সকল জাতিকেই যুগ যুগ ধরে আঘাত করছে।

আমরা যখন আজ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্য বদ্ধপরিকর তখন এ কথা আমাদের স্পষ্টভাবে বোঝা আবশ্যক যে, অন্তরের ঐক্য হারিয়ে শুধু বাহ্য বিধির ঐক্য-দ্বারা কোনো দেশ কখনোই সর্বজনীন একত্ববোধে মহাজাতীয় সার্থকতা পায় নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বহু উপরাষ্ট্রের সমবায়ে একটি প্রকাণ্ড রাষ্ট্র— যেন একটা বৃহৎ রেলোয়ে ট্রেন, অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গাড়ি পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে চলেছে সুনির্দিষ্ট পথে। সম্ভব হয়েছে তার একমাত্র কারণ— সেখানে সকলে শিক্ষায় দীক্ষায় নিবিড়ভাবে মিলে একজাতি হয়ে উঠেছে, মোটের উপরে ভাবনা ও বেদনার এক স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা সেখানে জনচিত্তকলেবর অধিকৃত। তারা পরস্পর পরস্পরের একপথে চলবার বাধা নয়, পরস্পরের সহায় তারা। তাদের শক্তি-সাফল্যের এই প্রধান কারণ।

খণ্ডিত মন ও আচরণ নিয়ে আমাদের ইতিহাসের গোড়া থেকে আমরা বরাবর হারতে হারতে এসেছি। আর, আজই কি আমরা সকল খণ্ডতা সত্ত্বেও জিতে যাব এমন দুরাশা পোষণ করতে পারি? বিদেশীর অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঐক্যের দরকার আছে এ কথা আমরা তর্কদ্বারা বুঝি,

কিন্তু কোনোমতেই সেই অন্তর দিয়ে বুঝি নে যেখানে বিচ্ছেদের বিষ ছড়িয়ে আছে। বেহারের লোক, মাদ্রাজের লোক, মাড়োয়ারের লোককে আমরা পর বলেই জানি, তার প্রধান কারণ, যে আচারের দ্বারা আমাদের চিত্ত বিভক্ত সে আচার কেবল যে স্বীকার করে না বুদ্ধিকে তা নয়, বুদ্ধির বিরুদ্ধে যায়। আমাদের ভেদের রেখা রক্তের লেখা দিয়ে লিখিত। মূঢ়তার গণ্ডির মতো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আর কিছুই নেই।

আমাদের দেশের হরিজন-সমস্যা এবং হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার মূলে যে মনোবিকার আছে তার মতো বর্বরতা পৃথিবীতে আর কী আছে জানি না। আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারি না, অথচ সে কথা স্বীকার না করে নিজেদের বঞ্চনা করতে যাই। মনে করি ইংলণ্ড্ স্বাধীন হয়েছে পার্লামেণ্টের রীতি মেনে, আমরাও সেই পথ অনুসরণ করব। ভুলে যাই যে, সে দেশে পার্লামেণ্ট্ বাইরে থেকে আমদানি করা জিনিস নয়, অনুকূল অবস্থায় ভিতর থেকে সৃষ্ট হয়ে ওঠা জিনিস। এককালে ইংলণ্ডে প্রটেস্টাণ্ট্ এবং রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে প্রবল বিরোধ ছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রভাবে তা ক্ষীণ হয়ে দূর হয়েছে। ধর্মের তফাত সেখানে মানুষকে তফাত করে নি।

মনুষ্যত্বের বিচ্ছিন্নতাই প্রধান সমস্যা। সেইজন্যই আমাদের মধ্যে কালে কালে যে-সব সাধক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়েছে তাঁরা অনুভব করেছেন— মিলনের পন্থাই ভারতপন্থা।

মধ্যযুগে যখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ বড়ো সমস্যা হয়ে উঠেছিল তখন দাদূ কবীর প্রভৃতি সাধকগণ সেই বিচ্ছেদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐক্য-সেতু প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে গেছেন।

কিন্তু একটা কথা তাঁরাও ভাবেন নি। প্রদেশে প্রদেশে আজ যে ভেদজ্ঞান, একই প্রদেশের মধ্যে যে পরস্পর ব্যবধান, একই সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে বিভক্তা, এ দুর্গতি তখন তাঁদের চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে নি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার বিচ্ছেদ আমাদের পীড়া দিচ্ছে। এই পীড়া উভয় পক্ষেই নিরতিশয় দুঃসহ দুর্বহ হয়ে উঠলে উভয়ের চেষ্টায় তার একটা নিষ্পত্তি হতে পারবে। কিন্তু এর চেয়ে দুঃসাধ্য সমস্যা হিন্দুদের, যারা শাশ্বত ধর্মের দোহাই দিয়ে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের প্রতি সুবুদ্ধিবিরুদ্ধ অসম্মানকর নিরর্থক ভাগ-বিভাগ নিত্য করে রাখে।

এইজন্যই মনে হয় নিবিড় প্রদোষান্ধকারের মধ্যে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের জন্ম একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। পাশ্চাত্য শিক্ষার অনেক পূর্বেই তাঁর শিক্ষা ছিল প্রাচ্য বিদ্যায়। অথচ ঘোরতর বিচ্ছেদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করবার মতো বড়ো মন তাঁর ছিল। বর্তমান কালে অন্তত বাংলাদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রথম দূত ছিলেন তিনি। বেদ-বেদান্তে উপনিষদে তাঁর পারদর্শিতা ছিল, আরবি-পারসিতেও ছিল সমান অধিকার— শুধু ভাষাগত অধিকার নয়— হৃদয়ের সহানুভূতিও ছিল সেইসঙ্গে। যে বুদ্ধি, যে জ্ঞান

দেশকালের সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে যায়, তারই আলোকে হিন্দু মুসলমান এবং খৃস্টান তাঁর চিত্তে এসে মিলিত হয়েছিল। অসাধারণ দূরদৃষ্টির সঙ্গে সার্বভৌমিক নীতি এবং সংস্কৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। শুধু ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর বুদ্ধি ছিল সর্বগ। এ দেশে রাষ্ট্রবুদ্ধির তিনিই প্রথম পরিচয় দিয়েছেন। আর, নারীজাতির প্রতি তাঁর বেদনাবোধের কথা কারো অবিদিত নেই। সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথার নামে ধর্মের অবমাননা তাঁর কাছে দুঃসহভাবে অশ্রদ্ধেয় হয়েছিল। সেদিন এই দুর্নীতিকে আঘাত করতে যে পৌরুষের প্রয়োজন ছিল আজ তা আমরা সুস্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারি নে।

রামমোহন রায়ের চিত্তভূমিতে বিভিন্ন সম্প্রদায় এসে মিলিত হতে পেরেছিল এর প্রধান কারণ— ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপদেশকে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ভারতীয় বিদ্যা এবং ধর্মের মধ্যে যেখানে সবাই মিলতে পারে সেখানে ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র, সেখান থেকেই তিনি বাণী সংগ্রহ করেছিলেন। সেই ছিল তাঁর পাথেয়। ভারতের ঋষি যে আলো দেখেছিলেন অন্ধকারের পরপার হতে, সেই আলোই তিনি আপন জীবনযাত্রাপথের জন্য গ্রহণ করেছিলেন।

ভাবলেও বিস্ময় জন্মে যে, সেই সময়ে কী করে আমাদের দেশে তাঁর অভ্যাগম সম্ভবপর হয়েছে। তখন দেশে একটা দল ইংরেজি শিক্ষার অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিলেন, ম্লেচ্ছবিদ্যাতে অভিভূত

হয়ে আমরা ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ব এই ছিল তাঁদের ভয়। এ কথা কেউ বলতে পারবে না যে, রামমোহন পাশ্চাত্য বিদ্যা-দ্বারা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর গভীর ছিল, অথচ তিনি সাহস করে বলতে পেরেছিলেন—দেশে বিজ্ঞানমূলক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার যথার্থ সমন্বয় সাধন করতে তিনি চেয়েছিলেন। বুদ্ধি জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের ক্ষেত্রে তাঁর এই ঐক্য-সাধনের বাণী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা।

আজ যদি তাঁকে আমরা ভালো করে স্বীকার করতে না পারি, সে আমাদেরই দুর্বলতা। জীবিতকালে তাঁর প্রত্যেক কাজে আমরা তাঁকে পদে পদে ঠেকিয়েছি। আজও যদি আমরা তাঁকে খর্ব করবার জন্য উদ্যত হয়ে আনন্দ পাই সেও আমাদের বাঙালি চিত্তবৃত্তির আত্মঘাতী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়।

তাঁকে কোনো বিশেষ আচারী সম্প্রদায় সহ্য করতে পারে নি, এতেই তাঁর যথার্থ গৌরবের পরিচয়। প্রচলিত ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আপনাকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে তিনি অনায়াসে জয়ধ্বনি পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে সবাইকে জড়িয়ে সমগ্র দেশের মধ্যে তাঁর বাণীকে প্রচার করে গেছেন। তাঁর এই কাজ সহজ কাজ নয়। এইজন্য তাঁকে আজ নমস্কার করি।

আমাদের অন্তরেও মুক্তি নেই, ঘরেও মুক্তি নেই। পর

পর বিদেশী আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হয়েছে। কেননা, অন্তরের সঙ্গে আমরা স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতে পারি নি, সকলকে আমরা গ্রহণ করতে পারি নি। আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, দুঃখ দারিদ্র্য এবং পরাভব যেখানে এত বড়ো সেখানে সকলকে গ্রহণ করার মতো বড়ো হৃদয়ও চাই। মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের সেইরকম বড়ো হৃদয় ছিল। আজ তাঁকেই নমস্কার করব বলে এখানে এসেছি।

১০ আশ্বিন ১৩৪৩

৫

মানুষ সন্ধানী। আদিকাল হতে সে কেবল খুঁজে খুঁজেই বেড়িয়েছে। যখন তার সমস্ত চিত্তের উন্মেষ হয় নি তখনো সে আপনার সন্ধান-প্রবৃত্তিকে ক্রমাগত জাগিয়েছে। এই চলার পথে পরিশ্রান্ত হয়ে সে কতবার তার চার দিকে একটা গণ্ডি টেনে দিয়ে বলেছে— এই হল আমার গম্যস্থান, এখান থেকে আর এক পা'ও নড়ব না। অভ্যাস আব অনুষ্ঠানের বেড়া গড়ে তুলে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে, যাতে তাকে আর সাধনা করতে না হয়, সন্ধান করে বেড়াতে না হয়। মন্ত্রকে খুঁটির মতো তৈরি করে সে তার চার দিকে কেবলই ঘানির বলদের মতো ঘুরেছে। পরিচিত কতকগুলো অভ্যাস অবলম্বন করে মানুষ আরাম চেয়েছে।

কিন্তু মানুষ তো আরামের জীব নয়। স্থাণুর মতো স্থির হয়ে আপাতপরিতৃপ্তি নিয়ে সে যখন বসে থাকে তখন তার সেই আরামলোভী সমাজের মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব নিয়ে মহা-মানুষ জন্মায়। সে বলে— আমরা তো গহ্বরচর জীব নই, একটা নিত্যনিয়মিত গতিহারা রুদ্ধ জীবনের আহার বিহার ও আরাম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে আমাদের চলবে না তো! মহা-পুরুষ সাধনার পথকে স্বীকার করে নেন, সত্যকে সন্ধান করে তিনি সেই গভীরকে সেই অসীমকে উপলব্ধি করতে চান। সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার সীমা অতিক্রম করার জন্যে তিনি

তাঁর বেড়া-ভাঙার বাণী নিয়ে আসেন। মনে করিয়ে দেন যে, আরামের মধ্যে আনন্দ নেই, আনন্দকে মিলবে কেবল সেই অসীমের প্রাঙ্গণে। লোকে বলে এতদিনকার অভ্যাস আর অনুষ্ঠান দিয়ে বেড়া তৈরি করেছি, এখন সে গণ্ডি ভাঙব কী করে ? এসেছি আমরা আমাদের গম্যস্থানে, আরামে আছি, আর খুঁজে বেড়াতে চাই না। তারা তাদের মিথ্যাকেই আঁকড়ে ধরে মহাপুরুষের সত্যবাণীকে অস্বীকার করে ; তাঁকে গাল দেয়, অপমানও করে। বিজ্ঞানের দিক দিয়েও আমরা দেখি মানুষ আরাম পাবার জন্যে তার বুদ্ধিকে একদা আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধেছে। প্রাচীনকালে লোক বলত যে, আকাশ একটা কঠিন গোলকার্ধ, তাতে নড়চড় নেই, মাথার উপর এই ফার্মামেণ্ট্ (firmament) কল্পনা করে নিয়ে এবং জগৎ-সংসারের সমস্ত নিয়ম একেবারে বেঁধে ফেলে মানুষ আরাম পেলে— যেন বিভ্রমের পথে তার ভ্রাম্যমাণ বুদ্ধির একটা স্থিতি হল। আমাদের দেশের জ্ঞানবৃদ্ধেরাও বলেছেন যে, সুমেরুশিখরের এক দিক দিয়ে সূর্য ওঠে এবং আর-এক দিকে নামে ; কচ্ছপের খোলসের উপর আর বাসুকির মাথায় পৃথিবী অবস্থিত এই কল্পনা করে ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তাঁরা একটা ব্যাখ্যা করে নিলেন। এতে করে তাঁদের বুদ্ধি আরাম পেলে। কিন্তু সে বাঁধা নিয়ম টিকল না তো। মানুষই তো শেষকালে বললে পৃথিবীও চলছে। আরামপ্রিয় মানুষ এই সম্ভাবনায় হিংস্র হয়ে উঠল, সন্ধানের দুরূহ পথে পরিশ্রান্ত হবার ভয়ে সে

বৈজ্ঞানিককে বললে তার কথা প্রত্যাহার করতে। মানুষ কিন্তু অভ্যাসকে মানে নি, যদিও সে বাঁধামতওয়ালাদের কাছে অবমানিত হয়েছে, মার খেয়েছে। প্রাণ দিয়েও মানুষ সত্যকে দেখাবার প্রয়াস করেছে, ভয় পায় নি।

ধর্মেও দেখি সেইরকম বাঁধা নিয়ম, কত শুচিতা, কত কৃত্রিম গণ্ডি। নিয়ম পালন ক'রে আচার আবৃত্তি আর অভ্যাস রক্ষা ক'রে সে তার চিন্তাকে অবকাশ দিতে চেয়েছে বহুবিধ জটিলতা থেকে। মানুষ বলেছে যে, আদিকাল থেকে ব্রহ্মা যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, তার বাইরে যাবার জো নেই। ফলে নিত্য কৃত্রিমতার দরুন তার মন অসাড় হয়ে যায়, সে তখন নিত্যধর্ম অর্থাৎ সত্যকে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করে। আমাদের দেশে ধর্মের যখন এইরকম নিঃসাড় অবস্থা তখন রামমোহন এসেছিলেন। বাঁধা নিয়মের পথ পরিত্যাগ করে তিনি দুর্গম পথের যাত্রী হয়েছিলেন। এ কথা বলা যাবে না যে, শাস্ত্রজ্ঞ না হয়ে তিনি অন্য পথ বেছে নিয়েছিলেন। আচার আবৃত্তি ও অনুষ্ঠানের মধ্যে মন তাঁর তৃপ্তি মানে নি, অসীমের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি উপনিষদের দ্বারে এসে পৌঁচেছিলেন। অন্যান্য মহাপুরুষের মতো তিনিও এসেছিলেন সন্ধানের পথে মানুষকে মুক্তি দিতে। তাঁদের মতোই কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা, কত অবমাননা তাঁকে সইতে হয়েছে, কিন্তু বিপদ কোনোদিন তাঁকে সত্যপথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি।

অতি বড়ো শোক ও বেদনার মধ্যে পিতামহীর মৃত্যুর

পর পিতা আমার শান্তি চেয়েছিলেন। তাঁর সেই পীড়িত ও শোকাতুর চিত্ত আকাশের দিকে হাত বাড়িয়েছিল; তিনিও প্রচলিত ধর্মের বাঁধন ছিঁড়ে এই উপনিষদের দ্বারে, সীমার ঊর্ধ্বে গিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করার জন্যে এসেছিলেন। মুক্তির জন্যে তিনি রামমোহনের কাছে গিয়েছিলেন।

রামমোহন সম্পর্কে আজকের দিনটা একটা স্মরণীয় দিন। ছোটো একটা মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল তাঁর চার দিকে; তাঁদের কাছে তিনি ধর্মপ্রচার করতে যান নি। তাঁদের সঙ্গে একসাথে সত্যের সাধনা করেছিলেন। অভ্যাসের টান এবং শাসন থেকে বন্ধনমোচন করতে তিনি এসেছিলেন মুক্তির দূত হয়ে। নিজের বন্ধন মোচন করে অপরকে মুক্ত করার কর্তব্য তিনি করে গিয়েছেন। তিনি যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে সে আমাদের নিজেদেরই ব্যর্থতা; যদি তাঁর সাধনার বীজ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে থাকে তবে তা হল সেই মহাপুরুষেরই কাজ।

১১ মাঘ [১৩৪২]

৬

আমাদের জীবনে যে-সব লাভ পরম লাভ মাঝে মাঝে তাই উপলব্ধি করবার জন্যে আমাদের উৎসবের দিন। সেদিন যা আমাদের শ্রেষ্ঠ, যা আমাদের সত্য, যা আমাদের গৌরবের, তারই জন্যে আসন প্রস্তুত হয়; অন্তরের আলো বড়ো করে জ্বালাই; যা আমাদের চিরন্তন সেদিন তাকে ভালো করে দেখে নেবার জন্যে আমরা মিলি।

পশুপাখিদেরও প্রাণের ঐশ্বর্য আছে। সে তাদের প্রাণ-শক্তিরই বিশেষ বিকাশ। পাখি উড়তে পারে এ তার একটি সম্পদ। মাঝে মাঝে এই সম্পদকে সে উপলব্ধি করতে চায়, মাঝে মাঝে সে ওড়ে, কোনো প্রয়োজনে নয়, ওড়বারই জন্যে; সে তার পক্ষচালনা দিয়ে আকাশে এই কথা ঘোষণা করে যে, 'আমি পেয়েছি।' এই তার উৎসব। বুনো ঘোড়া খোলা মাঠে এক-এক সময় খুব করে দৌড়ে নেয়— কোনো কারণ নেই। সে নিজেকে বলে, 'আমার গতিবেগ আমার সম্পদ— আমি পেয়েছি।' এই উৎসাহ ঘোষণা ক'রেই তার উৎসব। ময়ূর এক-একবার আপন মনে তার পুচ্ছ বিস্তার করে, আপন পুচ্ছশোভার প্রাচুর্য-গৌরব সে আপনারই কাছে প্রকাশ করে; আপন অস্তিত্বের ঐশ্বর্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে সে অনুভব করে যে, জীবলোকে তার একটি বিশেষ সম্মান আছে। সেও বলে, 'আমি পেয়েছি।'

কিন্তু মানুষের উৎসব তার প্রাণসম্পদের চেয়ে বেশি-কিছু নিয়ে। যা সে সহজে পেয়েছে তাতে সে অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে সমান, যা সে সাধনা করে পেয়েছে তাতেই সে মানুষ। সে আপনার ঐশ্বর্য আপনি যখন সৃষ্টি করে তখনি সে আপনাকে সত্য করে পায়। তখনি সে বলে, 'আমি পেয়েছি।' তার আনন্দ সৃষ্টির আনন্দ।

যা-খুশি তাই বানিয়ে তোলা মাত্রকেই সৃষ্টি বলে না। কোনো বিশ্বসত্যকে লাভ করার যোগে প্রকাশ ও প্রকাশ করার যোগে লাভ করাকেই বলে সৃষ্টি। সুতরাং সে কারো একলার নয়। পশুপক্ষীর যে উৎসবের কথা পূর্বে বলেছি সে তাদের একলার, মানুষের উৎসব সকলকে নিয়ে। লক্ষপতি তার ব্যবসায়ে মস্ত লাভ করতে পারে, তা নিয়ে সে ঘটা করে ভোজ দিতেও পারে, কিন্তু সেইখানেই সেটা ফুরালো— মানুষের উৎসবলোকে সে স্থান পেল না। সে আপন লাভকে অতি সতর্কতা ও কৃপণতার সঙ্গে লোহার সিন্দুকের মধ্যে বন্দী করে রাখে, তার পরে একদিন সে অতি কঠিন পাহারার ভিতর থেকেও শূন্যে অন্তর্ধান করে। সে নিজে সৃষ্টি নয় বলেই উৎসব সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি মানে উৎসৃষ্টি, যা সকল ব্যয়কে অতিক্রম করে দানরূপে থেকে যায়।

চিরকালের ঐশ্বর্য যখন তার কাছে প্রকাশ পায় তখন মানুষ বড়ো করে বলতে চায় 'আমি পেয়েছি'। এ কথা সে বলতে চায় সকল দেশকে, সকল কালকে, কেননা পাওয়া তার

একলার নয়। ঋষি একদিন বিশ্বকে বলেছিলেন, 'পেয়েছি, জেনেছি, বেদাহং।' ঋষি সেইসঙ্গেই বলেছেন, 'আমার পাওয়া তোমাদের সকলের পাওয়া, শৃণ্বন্তু বিশ্বে।' এই বাণীই উৎসবের বাণী। মানুষের উৎসবে চিরন্তন কালের আনন্দ ও আহ্বান।

ঘরে যখন কোনো শুভ ঘটনা ঘটে, যেমন সন্তানের জন্ম বা বিবাহ, সেটাতেও আমাদের দেশের মানুষ সকলকে ডাকে ; বলে, 'আমার আনন্দে তোমরাও আনন্দ করো। আমার গৃহের উৎসব যখন বাইরে গিয়ে পৌঁছবে তখনি তা সম্পূর্ণ হবে।' বস্তুত মানুষের ব্যক্তিগত শুভ ঘটনা, যা মানবসম্বন্ধের কোনো-একটি বিশেষ রূপকে প্রকাশ করে, যেমন জননীর সন্তানলাভ বা নরনারীর প্রেম-সম্মিলন, তাও একান্ত ব্যক্তিগত নয় ; নবজাত শিশু বা নবদম্পতি শুধু মাত্র ঘরের না, তারা সমস্ত সমাজের। এইজন্যে গৃহের উৎসবকে সর্বজনের উৎসব যখন করি তখনি তা সার্থক হয়।

আজকের উৎসবের বাণী হচ্ছে এই যে, সমস্ত মানবের হয়ে আমরা একটি ব্রত লাভ করেছি, ব্রতপতি আমাদের এই ব্রতকে সার্থক করুন। এ আমাদের মিলনের ব্রত। একটি মহৎ জীবনের ভিতর থেকে এই ব্রত উদ্‌ভাবিত— একজন মহামানব এর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, আমরা যেন একে গ্রহণ করি।

মানুষ তার যে জীবনকে সহজে পেয়েছে সেই জীবনকে সৃষ্টি করার দ্বারা বিশিষ্টতা দিলে তবেই তাকে যথার্থ করে পায়। তা করতে গেলেই কোনো-একটি বড়ো সত্যকে আপন

জীবনের কেন্দ্ররূপে আশ্রয় করা চাই। সেই কেন্দ্রস্থিত ধ্রুব সত্যের সঙ্গে আপন চিন্তাকে কর্মকে আপন দিনগুলিকে সংযুক্ত করে জীবনকে সুসংযত ঐক্য দিতে পারলে তবেই তাকে বলে সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কেন্দ্রটি না পেলে তার দিনগুলি হয় বিচ্ছিন্ন, তার কর্মগুলির মধ্যে কোনো নিত্যকালের তাৎপর্য থাকে না। তখন জীবনটা আপন উপকরণ নিয়ে স্তূপাকার হয়ে থাকে, রূপ পায় না। তাতেই মানুষের দুঃখ। এই বিশ্বসৃষ্টির যজ্ঞে যা-কিছু থাকে অস্পষ্ট, বিক্ষিপ্ত, যা-কিছু রূপ না পায়, তাই হয় বর্জিত। একেই বলে বিনষ্টি। যাঁরা আপনার মধ্যে সৃষ্টির সার্থকতা পেয়েছেন, যাঁরা নিজের জীবনের মধ্যে সত্যকে বাস্তব করে তুলেছেন, তাকে রূপ দিতে পেরেছেন, অমৃতাস্তে ভবন্তি।

অধিকাংশ মানুষ বিষয়লাভের উদ্দেশ্যকেই জীবনের কেন্দ্র করে। তার অধিকাংশ উদ্যম এই এক উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এতেও জীবনকে ব্যর্থ করে তার কারণ এই যে, মানুষ মহৎ। যতটুকু তার নিজের পোষণের জন্য, যতটুকু কেবল তার অদ্যতন, তাতে তার সমস্তটাকে ধরে না। এই সত্যটিকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষ দুটি শব্দ সৃষ্টি করেছে— অহং আর আত্মা। অহং মানুষের সেই সত্তা যার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও আয়োজন চিরকালের থেকে ক্ষণিকতার মধ্যে, সর্বলোকের থেকে এককের মধ্যে তাকে পৃথক করে রেখেছে। আর, আত্মার মধ্যে তার সর্বজনীন ও সর্বকালীন সত্তা। সমস্ত জীবন দিয়ে যদি মানুষ অহংকেই প্রকাশ করে তবে সে সত্যকে পায়

না; তার প্রমাণ, সে সত্যকে দেয় না। কেননা সত্যকে পাওয়া আর সত্যকে দেওয়া একই কথা, যেমন প্রদীপের পক্ষে আলো'কে পাওয়া। মানুষের পক্ষে আত্মাকে উপলব্ধি ও আত্মাকে দান করা একই কথা। আপনার সৃষ্টিতে মানুষ আপনাকে পায় এবং আপনাকে দেয়। এই দান করার দ্বারাই সে সর্বকাল ও সর্বজনের মধ্যে নিত্য হয়।

আমাদের মধ্যে বিচিত্র অসংলগ্ন ও পরস্পরবিরুদ্ধ কত প্রবৃত্তি রয়েছে। এগুলি প্রাকৃতিক— মাটি যেমন, শিলাখণ্ড যেমন প্রাকৃতিক। এরা সৃষ্টির উপকরণ। প্রকৃতির ক্ষেত্রে এদের অর্থ আছে, কিন্তু মানুষ এদের ভিতর থেকে আপন সংকল্পের বলে যখন একটি সম্পূর্ণ মূর্তি উদ্‌ভাবিত করে তখনি মানুষ এদের প্রতি আপন সার্থকতার মূল্য অর্পণ করে। বাঘের অস্তিত্বরক্ষায় প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রয়োজন আছে, তার হিংস্রতা তার জীবনযাত্রার উপযোগী, এইজন্য তার মধ্যে ভালোমন্দর মূল্যভেদ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র জৈব অস্তিত্বরক্ষায় মানুষের সম্পূর্ণতা নয়; বহুযুগের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে মানুষ আপনাকে সৃষ্টি করে তুলছে— সেই তার মনুষ্যত্ব। এই তার আপন সৃষ্টির পক্ষে তার প্রকৃতিগত যে উপাদান অনুকূল তাই ভালো, যা প্রতিকূল তাই রিপু। এইজন্যে মানুষের জীবনের মাঝখানে এমন একটি মূল সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকা চাই যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা-বিরুদ্ধতাকে সমন্বয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে ঐক্যদান করতে পারে। তবেই সে আপনার পরিপূর্ণ চিরন্তন

সত্যকে পায়। সেই সত্যকে পাওয়াই অমৃতকে পাওয়া, না পাওয়া মহতী বিনষ্টি। অর্থাৎ যে বিনাশ তার দৈহিক জীবনের অভাবের বিনাশ সে নয়, তার চেয়েও বেশি ; যা তার অমৃত থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিনাশ, তাই।

যেমন ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে তেমনি তার সমাজের পক্ষে একটি সত্যের কেন্দ্র থাকা চাই। নইলে সে বিচ্ছিন্ন হয়, দুর্বল হয়, তার অংশগুলি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে। সেই কেন্দ্রটি এমন একটি সর্বজনীন সত্য হওয়া চাই যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য দিতে পারে— নইলে তার না থাকে শান্তি, না থাকে শক্তি, না থাকে সমৃদ্ধি ; সে এমন-কিছুকে উদ্‌ভাবন করতে পারে না যার চিরকালীন মূল্য আছে। সমাজ মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো সৃষ্টি। সেইজন্যেই দেখি ইতিহাসের আরম্ভ হতেই, যখন থেকে মানুষ দলবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই, সে তার সম্মিলনের কেন্দ্রে এমন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যা তার সমস্ত খণ্ডকে জোড়া দিয়ে এক করতে পারে। এইটের উপরেই তার কল্যাণের নির্ভর। এইটেই তার সত্য, এইটেই তার অমৃত, নইলে তার বিনষ্টি।

বস্তুত এই ঐক্যের মূলে মানবজাতি এমন-কিছুকে অনুভব করে যার প্রতি তার ভক্তি জাগে, যার জন্যে সে প্রাণ দেয়, যাকে সে দেবতা বলে জানে। মানুষ বাহ্যত বিচ্ছিন্ন, অথচ তার অন্তরের মধ্যে পরস্পর-যোগের যে শক্তি নিয়ত কাজ

করছে তা পরম রহস্যময়, তা অনির্বচনীয় ; তা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দেশে কালে বহুদূরে অতিক্রম করে চলে। *

বিশেষ বিশেষ উপজাতি আপনাদের ঐক্যবন্ধনের গোড়ায় যে দেবতাকে স্থাপিত করেছে সেই দেবতাই বিশেষ সমাজের মধ্যে ঐক্য বিস্তার করলেও অন্য সমাজের বিরুদ্ধে ভেদবুদ্ধিকে একান্ত উগ্র করে তোলে। ধর্মের ঐক্যতত্ত্বকে সংকীর্ণ সীমায় স্থানিক রূপ দেবামাত্রই তা বাহিরের সঙ্গে বিচ্ছেদের সাংঘাতিক অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিভীষিকা অনেক আছে— ঝড়, বন্যা, অগ্ন্যুৎপাত, মারী—কিন্তু মানুষের ইতিহাস খুঁজে দেখলে দেখা যায় ধর্মের বিভীষিকার সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না। সর্বমানবের অন্তরতম যে গভীর ঐক্য, মানুষের ধর্মই তার সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু ছিল, এবং সেই শত্রুতা যে আজও ঘুচে গেছে তা বলতে পারি নে।

তাই যুগে যুগে যাঁরা সাধকশ্রেষ্ঠ তাঁদের সাধনা এই যে, দেবতার সম্বন্ধে মানুষের যে বোধ স্থানে রূপে ও ভাবে খণ্ডিত তাকে অখণ্ড করা ; সাম্প্রদায়িক কৃপণতা যে ধর্মকে আপন আপন বিশেষ বিশ্বাস বিধি ও ব্যবহারের দ্বারা বদ্ধ করেছে তাকে মুক্ত করে দিয়ে সর্বমানবের পূজাবেদিতে প্রতিষ্ঠিত করা। যখনি তা ঘটে তখনি সেই ধর্মের উৎসবে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি আহ্বান ধ্বনিত হয়, সেই উৎসবক্ষেত্র কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে না।

তখন ধর্মবোধের সঙ্গে যে অবাধ ঐক্যতত্ত্ব একাত্ম তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ইতিহাসে দেখা গেছে একদা য়িহুদিরা তাঁদের ঈশ্বরকে তাঁদের জাতিগত অধিকারের মধ্যে সংকীর্ণ করে রেখেছিলেন; তাঁদের ধর্ম তাঁদের দেবতার প্রসাদকে নিজেদের ইতিহাসের মধ্যে একান্ত পুঞ্জিত করে রাখবার ভাণ্ডারঘরের মতো ছিল। সেই দেবতার নামে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বনাশ করাকে নিজ-দেবতার পূজার অঙ্গ বলেই তাঁরা মনে করেছিলেন। তাঁদের দেবতাকে হিংস্র বিদ্বেষপরায়ণ রক্তপিপাসু -রূপে ধ্যান করাই তাঁদের বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। সেদিন তাঁদের ধর্মোৎসব তাঁদেরই মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছিল সংকুচিত। সেখানে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই শুধু যে ছিল অনাহূত তা নয়, তারা শত্রু বলেই গণ্য হত।

যিশু এলেন ধর্মকে মুক্তি দিতে। ঈশ্বরকে তিনি সর্বমানবের পিতা বলে ঘোষণা করলেন— ধর্মে সকল মানুষের সমান অধিকার, ঈশ্বরে মানুষের পরম ঐক্য, এই সাধনমন্ত্র যখন তিনি মানুষকে দান করলেন তখন এই সাধনার সম্পদ সকল মানুষের উৎসবের যোগ্য হল।

যিশুর শিষ্যেরা এই মন্ত্র সকলেই সত্যভাবে গ্রহণ করেছে এমন কথা বলতে পারি নে। মুখে যাই বলুক, পাশ্চাত্য জাতির ধর্মবুদ্ধি মোটের উপর ওল্ড্ টেস্টামেন্টের ভাবেই সংঘটিত। এইজন্য যুদ্ধবিগ্রহের সময় তারা ঈশ্বরকে নিজেদের দলভুক্ত

ব'লেই গণ্য করে, যুদ্ধে প্রতিকূল পক্ষ বিনষ্ট হলে তাতে তারা ঈশ্বরের পক্ষপাত কল্পনা ক'রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ঈশ্বরের নামে যে য়ুরোপে হিংস্রতা বহু শতাব্দী ধরে প্রশ্রয় পেয়েছে শুধু তাই নয়, যখন তারা যিশুর বাণীর প্রতিধ্বনি ক'রে স্বর্গরাজ্য-স্থাপনের কথা বলে তখন সেইসঙ্গেই নিজেদের রাজার জন্যে দেশের জন্যে ঈশ্বরের কৃপায় সকলপ্রকার উপায়ে মর্তরাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকেই জয়ী করতে চেষ্টা করে। এমন-কি, যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাদের ধর্মযাজকেরা যত বিদ্বেষের উত্তেজনার অনুমোদন করেছে, এমন সৈনিকেরাও নয়।

এর কারণ, বাইবেলে যে অংশে ঈশ্বর রাগদ্বেষচালিত দলপতিরূপে কল্পিত ও বর্ণিত, সেই অংশই তাদের নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহায় হয়ে তাদের অহমিকা ও পরজাতি-বিদ্বেষকে বল দিয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও খৃস্টের বাণী-যে কাজ করছে না তা হতেই পারে না। তার কাজ গূঢ় গভীর। বস্তুত আমাদের স্বাভাবিক অহংকার দেবতাকে ক্ষুদ্র ক'রে আমাদের শুভবুদ্ধিকে খণ্ডিত করে বলেই পরম সত্যের অদ্বৈতরূপ উপ-লব্ধির জন্যে আমাদের আত্মার এত গভীর প্রয়োজন।

বুদ্ধদেব জাতিবর্ণ ও শাস্ত্রের সমস্ত ভাগবিভাগ অতিক্রম করে বিশ্বমৈত্রী প্রচার করেছিলেন। এই বিশ্বমৈত্রী যে মুক্তি বহন করে সে হচ্ছে অনৈক্যবোধ থেকে মুক্তি। রিপুমাত্রই মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ ঘটায়, কেননা ভেদ আমাদের অহং-এর মধ্যে, এবং আমাদের রিপুগুলি এই অহং-এরই

অনুচর। তারা আত্মাকে অবরুদ্ধ করে। সাধকেরা যখন ঐক্যের বিশ্বক্ষেত্রে আত্মাকে মুক্তি দান করেন তখনি তার আনন্দকে তার উৎসবকে সর্ব-দেশে-কালে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগে যখন মুসলমান বাহির থেকে এল তখন সেই সংঘাতে দুই ধর্মের পরীক্ষা হয়েছিল। দেখা গেল এই দুই ধর্মের মধ্যেই এমন-কিছু ছিল যাতে মানুষে মানুষে শান্তি না এনে নিদারুণ বিরোধ জাগিয়েছে। হিন্দুধর্ম সেদিন হিন্দুকেও ঐক্যদান করে নি, তাকে শতধা বিভক্ত ক'রে তার বল হরণ করেছে। মুসলমান-ধর্ম আপন সম্প্রদায়কে এক করা দ্বারা বলীয়ান করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবোধ নির্দয়ভাবে প্রবল ছিল বলেই সাম্প্রদায়িক ভিন্নতার ভিতর দিয়েও মানুষের অন্তরতর ঐক্যকে উপলব্ধি করে নি। বাইরের দিক থেকে আঘাত ক'রে মুসলমান মানুষের বাহ্যরূপের প্রভেদকে সবলে একাকার করে দিতে চেয়েছিল। অপর পক্ষে ধর্মের বাহ্যরূপের বেড়াকে বহুগুণিত ক'রে হিন্দু, মানুষে মানুষে যে বাহ্যভেদ আছে তার উপর স্বয়ং ধর্মের স্বাক্ষর দিয়ে, তাকে নানা বিধি বিধান ও সংস্কারের দ্বারা আটঘাট বেঁধে পাকা করে দিয়েছিল। সেদিন এই দুই পক্ষে ধর্মবিরোধের অন্ত ছিল না— আজও সেই বিরোধ মিটতে চায় না।

সেদিন ভারতে যে-সব সাধক জন্মেছিলেন তাঁরা ভেদবুদ্ধির নিদারুণ প্রকাশ দেখেছেন। তাই মানুষের চিরকালীন সমস্যার সমন্বয় করবার জন্যে তাঁদের সমস্ত মন জেগেছিল। এই সমস্যা

হচ্ছে— ধর্মের বলে ভেদের মধ্যে অভেদের সেতু স্থাপন করা। সে কেমন করে হতে পারে? না, সকল ধর্মের বাহিরে দেশ-কালের আবর্জনা জমে উঠে তার সাম্প্রদায়িক রূপকে কঠিন করে তোলে— সে দিকে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়কে বাধা দেয়, আঘাত দেয়— কিন্তু তাদের মধ্যে যে অন্তরতম সত্য সেখানে ভেদ নেই, বাধা নেই। এক কথায় অবিদ্যার মধ্যেই বাধা, অজ্ঞানের বাধা। যেখানে কোনো-এক শাস্ত্রে বলে বাসুকির মাথার উপরে পৃথিবী স্থাপিত; সেখানে আর-এক শাস্ত্র বলে দৈত্যের কাঁধের উপর পৃথিবী স্থাপিত; এই মতভেদ নিয়ে আমরা যদি খুনোখুনি করি তবে সেই অজ্ঞানের লড়াই বাইরের দিক থেকে কিছুতেই মিটতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের দিকে বিরোধ মেটে এইজন্যে যে, সেখানে বিশ্বাসের যে আদর্শ সে বিশ্ব-জনীন বুদ্ধি; সে প্রথাগত বিশ্বাস নয়, লোকমুখের কথা নয়।

আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে বিশ্বজনীনতা আছে, সাম্প্রদায়িক প্রথার মধ্যে নেই। সেইজন্য ভারতবর্ষের ঐক্যসাধক ঋষিরা সকল ধর্মের মূলে যে চিরন্তন ধর্ম আছে তাকেই ভেদবোধ-পীড়িত মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। শাস্ত্র সাময়িক ইতিহাসের, আত্মপ্রত্যয় চিরকালের। শাস্ত্র ভেদ ঘটায়, আত্মপ্রত্যয় মিলন আনে। দাদূ কবীর নানক প্রভৃতি মধ্য-যুগের ভারতীয় সাধকেরা ধর্মের শাস্ত্রীয় বাহ্যরূপের বাধা ভেদ করে এক পরম সত্যের আধ্যাত্মিক রূপকে প্রচার করেছিলেন। সেইখানেই সকল বিরোধের সমন্বয়।

এই বিরোধসমন্বয়ের প্রয়োজন ভারতে যেমন এমন আর কোথাও নয়। এই ভারত-ইতিহাসে সকলের চেয়ে উজ্জ্বল নাম তাঁদেরই যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ-শান্তি করতে চেয়েছেন। তাঁদের যে গৌরব সে রাষ্ট্রনীতির কূটবুদ্ধির গৌরব নয়, সে গৌরব সহজ সাধনার। এ দেশে বড়ো বড়ো যোদ্ধা ও সম্রাটের জন্ম হয়েছিল, ঐতিহাসিক বহু অন্বেষণে কালের আবর্জনাস্তূপের মধ্যে থেকে তাদের লুপ্তপ্রায় নাম উদ্ধার করে আনেন। কিন্তু এই যে-সব সাধক বাহ্যিকতার আবরণ দূর করে ধর্মের আধ্যাত্মিক সত্যকে সর্বজনের কাছে প্রকাশ করেছেন, তাঁরা একদা সর্বজনের কাছে যতই আঘাত ও প্রত্যাখ্যান পেয়ে থাকুন, দেশের চিত্ত থেকে তাঁদের নাম কিছুতে লুপ্ত হতে চায় না। এঁরা অনেকেই ছিলেন অবিদ্বান অন্ত্যজজাতীয়, কিন্তু এঁদের সম্মান সর্বকালের; এঁরা ভারতের সব চেয়ে বড়ো অভাব মেটাবার সাধনা করেছেন, এবং ভেবে দেখতে গেলে সেই অভাব সমস্ত মানুষের।

আধুনিক ভারতে সেই সাধনার ধারা বহন করে এনেছেন রামমোহন রায়। তিনি যখন এলেন তখন সমস্যা আরো জটিলতর, তখন প্রবল রাজশক্তির হাত ধরে খৃস্টান-ধর্মও এই ধর্মভারবিদীর্ণ দেশে এসে প্রবেশ করেছে। রামমোহন রায় অপমান ও অত্যাচার স্বীকার করে ধর্মের সর্বজনীন সত্যের যোগে মানুষের বিচ্ছিন্ন চিত্তকে মেলাবার উদ্দেশে তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মানবলোকে যাঁরা মহাত্মা তাঁদের

এই সর্বপ্রধান লক্ষ্য। মানুষের পরমসত্য হচ্ছে মানুষ এক; এই সত্যকে প্রশস্ত ও গভীরতম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের কাজ। রামমোহন আত্মার দৃষ্টিতে সকল মানুষকে দেখেছিলেন এবং আত্মার যোগে সকল মানুষকে ধর্মসম্বন্ধে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের প্রাচীনতন সাধকরাও এই ঐক্যের বাণী চিরকালের মতো আমাদের দান করে গেছেন। তাঁরা বলেছেন শান্তং শিবমদ্বৈতং— যিনি অদ্বৈত, যিনি এক, তাঁর মধ্যেই মানুষের শান্তি, তাঁর মধ্যেই মানুষের কল্যাণ। এই বাণী অনেক কাল ভারতে সাম্প্রদায়িক কোলাহলে প্রচ্ছন্ন হয়েছিল। তিনি তাকেই তাঁর জীবনে তাঁর কর্মে ধ্বনিত করে তুললেন। আজ প্রায় একশো বছর হল তিনি এই একের মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন। যে ইচ্ছা ভারতবর্ষের গূঢ়তম ইচ্ছা, সেই তার চিরকালের ইচ্ছার সঙ্গে আজকের দিনের যোগ আছে। ভারতের সেই ইচ্ছাই একশত বৎসর পূর্বে ভারতের এক বরপুত্রের জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল এবং এই দিনেই তাকে তিনি সফলতার রূপ দিতে চেয়েছিলেন। জানি সকলে তাঁকে স্বীকার করবে না এবং অনেকে তাঁকে বিরুদ্ধতার দ্বারা আঘাত করবে। কিন্তু জীবনে যাঁরা অমৃত লাভ করেছেন, প্রতিকূলতার সাময়িক কুহেলিকায় তাঁদের দীপ্তিকে গ্রাস করতে পারবে না। তাই যাঁদের মনে শ্রদ্ধা আছে তাঁরা ভারতের সনাতন ঐক্যবাণীর একটি উৎসমুখ বলেই আজকের

এই দিনের পবিত্রতাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করবেন, এবং রামমোহনের মধ্যে যে প্রার্থনা ছিল সেই প্রার্থনাকে কায়মনো-বাক্যে উচ্চারিত করবেন যে, ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্নতা থেকে, জড়বুদ্ধি থেকে, বহিরন্তরের দাসত্বদশা থেকে, মুক্তিলাভ করুক— য একঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

১১ মাঘ [১৩৩৫]

৭

বন্ধুগণ, জরার ক্লান্তিতে আজ আমি অভিভূত। একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও এই স্মরণ-উৎসবে সম্পূর্ণভাবে যোগ দিতে পারি নি, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আজ আমাদের উপাসনার একটি বিশেষ দিন। উপাসনার বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ আমাদের কাছে সময়-সময় উপস্থিত হয়। প্রকৃতির মধ্যেও দেখি, ঋতু-ঋতুতে নূতন নূতন উৎসব। প্রত্যেক ঋতু তার নিজের অর্ঘ্যনিবেদন বহন করে আনে। শরৎ যখন তার শিশিরধৌত নির্মল সৌন্দর্যের প্রাচুর্য নিয়ে দেখা দেয়, তখন সে আমাদের আত্মাকে আহ্বান করে, তখন আমাদের একটি বিশেষ বন্দনার দিন উপস্থিত হয়। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে আমরা শুনতে পাই বহুবিচিত্রকে নিয়ে একটি অখণ্ড সুষমার বাণী। জলে স্থলে আকাশে রূপসম্মিলনের মধ্যে সেই অপরূপ একের সংগীত কেবল আমাদের আত্মার কাছেই পৌঁছায়— সে এমন একটি লিপি যার ঠিকানা একমাত্র এইখানেই।

সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। তাকে আমরা কোনোরকম ব্যাখ্যার দ্বারা বোঝাতে পারি না। আমাদের অন্তরতম উপলব্ধির দ্বারা তাকে আমরা শুধু স্বীকার করতে পারি। সংসারের সমস্ত-কিছু প্রয়োজনকে অতিক্রম করে এই সৌন্দর্য বিরাজমান। সৃষ্টি- রক্ষা বা পালনের কোনো তাগিদ দিয়ে তার হিসাব পাওয়া যায় না। সকল প্রয়োজনের অতীত যে ঐশ্বর্য, বিশ্বজগতে আনন্দরূপের আবির্ভাবকে সে প্রকাশ করে। তাই সংসারযাত্রার প্রতিদিনের সমস্ত অব্যবহিত দাবি চুকিয়ে দিয়েও যে অসীম উদ্‌বৃত্ত সৌন্দর্য দেখা দেয় তার মধ্যেই আমাদের আত্মা বিশ্বের নিত্যোৎসবের মূল সুরটিকে উপলব্ধি করতে পারে।

জীবনযাত্রার ছোটোখাটো খুঁটিনাটির মধ্যে আমরা এই মূলসুরটিকে ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করে দেখি বলে তাকে তার বৃহৎ তাৎপর্যের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি না। যদি আদ্যন্ত দেখতে পেতেম, যে দেখা নানা বাধায় নানা বিরুদ্ধতার দ্বারা খণ্ডিত নয় এমন একটি স্বচ্ছ সমগ্র দেখা দিয়ে যদি অনুভব করতে পারতেম, তবে আমাদের মন অহৈতুক আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ত। জানতে পারতেম, যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য আমরা শরৎকালের একটি শেফালির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তারই ছন্দ লোকে লোকে আকাশে আকাশে পরিব্যাপ্ত। প্রতিদিনকার কাজ চালাবার দেখার মধ্যে আমাদের আত্মার সেই দেখা চাপা পড়ে, আনন্দরূপের পূর্ণতাবোধ ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে ফেলি, তার পরে নতুন ঋতু যখন পুরাতন ঋতূৎসবের পালা বদল করার আয়োজন করে তখন তার রাগিণীতে সেই মূলসুরের ধুয়াটিকে নতুন করে পাই। চন্দ্রতারাখচিত নীল আকাশে বিশ্বের যে আশ্চর্য-সুন্দর শতদলটি আলোকের সরোবরে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠছে তাকে সম্পূর্ণ করে সমগ্রভাবে যিনি দেখছেন তাঁর সেই স্থিরগম্ভীর আনন্দের আংশিক উপলব্ধি আমরা অনুভব করি।

এইরকম করেই আমাদের আর-একটি বন্দনার বিষয় হয় যখন আমরা কোনো মহাপুরুষের মধ্যে সেই মহতোমহীয়ানের পরিচয় পাই। এই পরিচয়ের মধ্যে একটি প্রতিবাদ আছে, যে প্রতিবাদ আমরা প্রকৃতির মহোৎসবের মধ্যেও দেখি। চারি দিকে শ্রীহীনতার অভাব নেই— কত কুৎসিত মলিনতা, কত আবর্জনা, কত অসম্পূর্ণতা প্রতিনিয়তই দেখতে পাই। কিন্তু তারই মধ্যে দেখি সুন্দরকে— দেখি ক্ষণজীবী প্রজাপতির ক্ষীণ সূক্ষ্ম সুকুমার পাখার রঙে রেখায় আশ্চর্য নৈপুণ্য— তখন বুঝি যা-কিছু কুশ্রী তার বিরুদ্ধে চিরকাল ধরে চলেছে সৌন্দর্যের এই প্রতিবাদ। তখন বুঝি সমস্ত কুশ্রীতাকে অতিক্রম করে সৌন্দর্যই

ধ্রুবসত্য। বিশ্বজগতের ভিতরে ভিতরে আমাদের আত্মা যখন ছন্দোময় সামঞ্জস্যকে আবিষ্কার করে তখন দেখি, অনন্ত আকাশে সৌন্দর্যের তপস্যার আসন বিস্তীর্ণ। যা কুশ্রী, যা নিরর্থক, যা খণ্ড, সে-সমস্তকে একটি আশ্চর্য সুষমার মধ্যে সুপরিমিত করে নেবার জন্যে বিশ্বজগতের অন্তরে অন্তরে একটি অবিশ্রাম প্রবর্তনা কাজ করছে। বিক্ষিপ্তকে সংযত, বিকৃতকে সংস্কৃত করবার এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যতত্ত্ব আশ্রয় করে আছে আনন্দস্বরূপকে অমৃতস্বরূপকে। বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত করে আনন্দরূপমমৃতং প্রকাশমান বলেই এটি সম্ভবপর হয়েছে।

মানবাত্মার মধ্যেও কত দীনতা, কত কলুষ, কত হিংসা দ্বেষ সর্বদাই প্রকাশ পাচ্ছে জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বাস আসে— এ-সমস্তকে অতিক্রম করে যিনি শিবং তিনি আছেন। মহাপুরুষের জীবনের মধ্যে আমরা এই ইঙ্গিত পাই। যা-কিছু অশিব তাকে পরাভূত করে সমস্ত বিরুদ্ধতার সম্মুখে এসে মহাপুরুষের জীবন যখন দাঁড়ায়, আঘাত-অপমানের মাঝখানে কল্যাণের তপস্যাকে সার্থক করে, তখন সেই আশ্চর্য আবির্ভাবের সম্পূর্ণ যে অর্থ তাকে দেখি। প্রমাণ পাই যে, যুগে যুগে কলুষ ক্ষয় করছেন যিনি, অকল্যাণকে দুঃখের মধ্য দিয়ে কল্যাণে উত্তীর্ণ করছেন যিনি, তিনিই মহাপুরুষের বাণীর ভিতর দিয়ে বিরোধ-সংঘাতের মধ্যে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়কে, জাতির সঙ্গে জাতিকে, ইতিহাসের বিপদসংকুল বন্ধুর পথে একসূত্রে বেঁধে দিচ্ছেন, তখন জানি যে তাঁকে প্রণাম করার দিন উপস্থিত।

আমাদের উপাসনায় ধ্যানের যে মন্ত্র আমরা ব্যবহার করি— সত্যং জ্ঞানং অনন্তং— সেই মন্ত্রের গভীর অর্থ হচ্ছে এই যে, চোখের দেখায় সত্যকে পাওয়া যায় না। মানুষের আত্মা নিজের জানবার ধর্ম দিয়েই সত্যের স্বরূপকে দেখে। চোখের দেখা বিচ্ছিন্ন, আত্মার দেখা ঐক্যে

বাঁধা। ইন্দ্রিয়বোধ সেই একের বোধ নয়। আত্মা নিজের মধ্যে দেশকালের ভূমিকায় দেশ ও কালকে, সমগ্রভাবে অখণ্ডভাবে বিশ্ব-জগতের ঐক্যসূত্রটিকে, আবিষ্কার করার দ্বারাই সত্যকে উপলব্ধি করে। চোখ দিয়ে যখন অসীমতাকে দেখতে যাই তখন আয়তনের মধ্যে সংখ্যার মধ্যে তাকে খুঁজি। এমন করে বাহিরের দিক থেকে অসীমের সত্যকে পাওয়া যায় না। যত ছোটো আয়তনের মধ্যেই হোক না কেন, পরিপূর্ণতাকে যখন আত্মার দৃষ্টি দিয়ে দেখি তখন পাই অনন্ত সত্যকে। শিবকে অশিবের মধ্যে দেখা— সেও হচ্ছে আত্মার দেখা। মহাপুরুষেরা এই দৃষ্টি নিয়ে আসেন। তাঁরা বিপদকে ভয় করেন না, নিন্দা-ক্ষতিকে গ্রাহ্য করেন না। অবমাননার ভিতর দিয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেন। যাঁরা মহৎ ভগবান তাঁদের বাহিরের দিক থেকে দয়া করেন না। নিষ্ঠুর ভগবান মহাপুরুষকে সম্মানের পথে পুষ্পবৃষ্টির ভিতর দিয়ে আহ্বান করেন না, দুঃখের কঠোর পথই তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সেইজন্য দুঃখের মধ্যেই মহাপুরুষের জীবনের সার্থকতা তাঁর সত্যের প্রমাণ। এই নির্দয়তার মধ্যে আমরা দেখি ভগবানের দয়া— তখন ভয় যায়, তখন আমরা ভরসা পাই, তখন আমরা প্রণাম করি।

এই প্রণামের পরিপূর্ণ প্রার্থনা হচ্ছে 'অসতো মা সদ্‌গময়'— অসত্য আছে জানি, তার মধ্যেই সত্য দেখা দাও। কে এই সত্যকে আমাদের কাছে উজ্জ্বল করে দেখায়? যখন বহুল উপকরণের প্রয়োজনকেও অস্বীকার করে মানুষ বলতে পারে 'যা অমৃত নয় তা নিয়ে আমি কী করব', বীর যখন আঘাতের পর আঘাতেও অবসন্ন হন না, তখন অসত্যের মাঝখানে সত্যের যে আবির্ভাব তাকে আমরা দেখতে পাই। মানব-ইতিহাসের সংকটময় নিত্যবাধাগ্রস্ত অভিযানের মধ্যে আমরা সত্যের প্রকাশকে দেখি। আবার নিজের মধ্যেও দেখি— বিরুদ্ধতাকে

অতিক্রম ক'রে অসত্যকে পরাভব ক'রে সত্য প্রকাশ পায়। তখন এই বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়েই আমাদের প্রণাম পৌঁছয়। তখন বলি 'আবিরাবীর্ম এধি'— আমার অপ্রকাশের অস্বচ্ছতার মধ্যেই তোমার প্রকাশ উজ্জ্বল হোক। তখন আমরা বলি 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'— অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে আলোক প্রকাশ পাক। 'মৃত্যোর্মামৃতং গময়'— মৃত্যুর মধ্যে অমৃত জাগ্রত হউক।

আজ যাঁকে আমরা স্মরণ করছি, রুদ্রের আহ্বান সেই মহাপুরুষকেও একদিন ডাক দিয়েছিল। রুদ্র নিজে তাঁকে আহ্বান করেছিলেন— সেই আহ্বানের মধ্যেই রুদ্রের প্রসন্নতা তাঁকে আশীর্বাদ করেছে। সুখ নয়, খ্যাতি নয়, বিরুদ্ধতার পথে অগ্রসর হওয়া এই ছিল তাঁর প্রতি রুদ্রের নির্দেশ। আজও সে আহ্বান ফুরোয় নি। আজ পর্যন্ত তাঁর অবমাননা চলেছে। তিনি যে সত্যকে বহন করে এনেছেন দেশ এখনো সে সত্যকে গ্রহণ করে নি। যত দিন না দেশ তাঁর সত্যকে গ্রহণ করবে ততদিন এই বিরুদ্ধতা চলতেই থাকবে। দিন-মজুরি দিয়ে জনতার স্তুতিবাক্যে তাঁর ঋণ শোধ হবে না— রুদ্রের হাতে তাঁকে অপমান সহ্য করতে হবে। এই হচ্ছে তাঁর রুদ্রের প্রসাদ। তাঁর জন্য কোনো ছোটো পুরস্কারের ব্যবস্থা হয় নি। নিন্দা-অপমানের ভিতর দিয়েই সত্যকে প্রকাশ করতে হবে, ক্ষতির মধ্যেই সত্যকে লাভ করতে হবে, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে জাগ্রত করতে হবে।

তাই আজ আমাদের প্রার্থনা যেন ছোটো না হয়। ভীরুর মতো বলব না 'আমাদের দুঃখ দূর করো'। বীরের মতো বলব, 'দুঃখ দাও, বিপদ দাও, অপমানের পথে আমাদের নিয়ে যাও। কিন্তু দুঃখ বিপদ অপমানের মধ্যেও অন্তরে যেন তোমার প্রসন্নতার আশীর্বাদ অনুভব করি।'

হে রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্— তোমার যে

প্রসন্নমুখ, আমাদের দেখাও। তমসো মা জ্যোতির্গময়—অন্ধকারের মধ্যে তোমার জ্যোতি প্রকাশ করো। হে রুদ্র, হে নিষ্ঠুর, ক্ষতি-পরাভবের ভিতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাও। বাহিরের আঘাতের দ্বারা আমাদের শক্তিকে অন্তরে অন্তরে পুঞ্জিত করো।

আজ যাঁকে আমরা স্মরণ করছি, যিনি রুদ্রের এই জয়পতাকা বহন করে এনেছিলেন, যিনি আমার পরম পূজনীয়, যাঁর কাছ থেকে আমার জীবনের পূজা— আমার সমস্ত জীবনের সাধনা আমি গ্রহণ করেছি, আজ তাঁর কথা বলতে পারি এমন শক্তি আমার নেই, আজ আমার কণ্ঠ ক্ষীণ। যদি কিছুই না বলতে পারি এই মনে করে আমি কিছু লিখেছিলাম, সেই লেখাটুকু পড়ে আমার বক্তব্য শেষ করব।

মহাপুরুষ যখন আসেন তখন বিরোধ নিয়েই আসেন, নইলে তাঁর আসার কোনো সার্থকতা নেই। ভেসে-চলার দল মানুষের ভাঁটার স্রোতকেই মানে। যিনি উজিয়ে নিয়ে তরীকে ঘাটে পৌঁছিয়ে দেবেন তাঁর দুঃখের অন্ত নেই, স্রোতের সঙ্গে প্রতিকূলতা তাঁর প্রত্যেক পদেই। রামমোহন রায় যে সময়ে এ দেশে এসেছিলেন সেই সময়কার ভাঁটার বেলার স্রোতকে তিনি মেনে নেন নি, সেই স্রোতও তাঁকে আপন বিরুদ্ধ বলে প্রতিমুহূর্তে তিরস্কার করেছে। হিমালয়ের উচ্চতা তার নিম্নতলের সঙ্গে অসমানতারই মাপে। সময়ের বিরুদ্ধতা দিয়েই মহাপুরুষের মহত্ত্বের পরিমাপ।

কোনো জাতির ইতিহাসে মানুষের প্রাণ যতদিন প্রবল

থাকে ততদিন সে আপন মর্মগত জাগ্রৎশক্তিতে নিজেকে নিজে নিরন্তর সংশোধন করে জয়ী করে চলতে পারে। বস্তুত প্রাণের প্রক্রিয়াই তাই। সে তো নিত্যসংগ্রাম। আমরা চলি, সে তো প্রতি পদক্ষেপেই মাটির অবিশ্রাম আকর্ষণের সঙ্গে বিরোধ। জড়তার ব্যূহ চারি দিকেই, দেহের প্রত্যেক যন্ত্রই তার সঙ্গে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত। হৃদ্‌যন্ত্র চলছে, দিনে রাত্রে, নিদ্রায় জাগরণে; জড় রাজ্যের প্রকাণ্ড নিষ্ক্রিয়তা সেই চলার বিরুদ্ধ, মুহূর্তে মুহূর্তেই সে ক্লান্তির বাঁধ বাঁধতে চায়, যতক্ষণ জোর থাকে হৃদ্‌যন্ত্র মুহূর্তে মুহূর্তেই সেই বাধাকে অপসারণ করে চলে। বাতাস আমাদের চারি দিকে আপন নিয়মে প্রবাহিত, তাকে প্রাণের ব্যবস্থাবিভাগ আপন নিয়মের পথে প্রতিক্ষণেই বলপূর্বক চালনা করে। রোগের কারণ ও বীজ অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই, দেহের আরোগ্যসেনানী তাকে সর্বদাই আক্রমণ করছে— এর আর অবসান নেই। জড়ধর্মের সঙ্গে জীবধর্মের, রোগশক্তির সঙ্গে আরোগ্যশক্তির নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধক্রিয়াকেই বলে প্রাণক্রিয়া। সেই সচেষ্ট শক্তি যদি ক্লান্ত হয়, এই প্রবল বিরোধে যদি শৈথিল্য ঘটে, দেহব্যবস্থায় চলার চেয়ে না-চলার প্রভাব যদি বেড়ে ওঠে, তবেই বিকৃতি ও মলিনতায় দেহ কেবলই অশুচি হতে থাকে, তখন মৃত্যুই করুণারূপে অবতীর্ণ হয়ে এই শ্রান্তসংগ্রাম পরাভবকে জীবজগৎ থেকে অপসারিত করে দেয়।

সমাজদেহও সজীব দেহ। জড়ত্বের মধ্যেই তার সমস্ত

অমঙ্গল। সমাজের যুদ্ধকুশল প্রাণধর্মকে বুদ্ধির ম্লানতা, সংকল্পের দৈন্য, জ্ঞানের সংকীর্ণতা, প্রীতিমৈত্রীর দৌর্বল্যের সঙ্গে কেবলই বিরোধ জাগিয়ে রাখতে হয়। চিত্তের অসাড়তা তার সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। চিত্ত যখন আপন কর্তৃত্বকে খর্ব করে স্থাবর হয়ে বসতে চায় তখনি তার সর্বত্রই বিকৃতির আবর্জনা জমে উঠে তাকে অবরুদ্ধ করে দেয়। এই অবরোধেই মৃত্যুর আরম্ভ। এই সময়ে আসেন যে মহাপুরুষ তিনি জড়ত্ব-পুঞ্জের মধ্যে প্রবল বিরোধ নিয়ে আসেন, নির্বিচার প্রথার দ্বারা চালিত দীনাত্মা তাঁকে সহ্য করতে পারে না।

সুদীর্ঘকাল থেকেই ভারতবর্ষে ইতিহাস স্তম্ভিত হয়ে আছে। কতকাল এই দেশ নিজে চিন্তা করে নি, চেষ্টা করে নি, সৃষ্টি করে নি, বুদ্ধিপূর্বক নিজের অন্তর-বাহিরের সম্মার্জন করে নি, তার সক্রিয় সংকল্প-শক্তি নব নব ব্যবস্থার দ্বারা নব নব কালের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে নি। স্বাস্থ্যদৈন্য, অন্নদৈন্য, জ্ঞানদৈন্য, একে একে তার প্রাণের প্রায় সকল শিখাই ম্লান করে এনেছে। শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে তার পরাভব বিস্তীর্ণ হয়ে চলল। মানুষের পরাভব তাকেই বলে যখন তার আপন ইচ্ছায় অরাজকতা ঘটে এবং বাহিরের ইচ্ছা শূন্য সিংহাসন অধিকার করে বসে; যখন তার নিজের বুদ্ধি অবসর নেয়, বাহিরের বুদ্ধি তাকে চালনা করে— সেই বুদ্ধি তার স্বজাতির অতীত কাল থেকেই তাকে অভিভূত করুক, বা অন্যজাতির বর্তমান কাল থেকে এসেই তাকে

ঘুরিয়ে বেড়াক। মানুষের পরাভব তাকেই বলে যখন তার আত্মার কর্তৃত্ব আড়ষ্ট হয়, যখন সে কালপরম্পরাগত অভ্যাস-যন্ত্রের চাকাগুলোকে অন্ধভাবে ঘুরিয়ে চলে; যখন সে যুক্তিকে স্বীকার করে না, উক্তিকে স্বীকার করে; আন্তরধর্মকে খর্ব ক'রে বাহ্য কর্মকে প্রবল করে তোলে। কোনো কূট-কৌশলের দ্বারা বাহিরের কোনো সংকীর্ণ সংক্ষিপ্ত পথে এই স্থবিরত্বভার-মন্থর মানুষের পরিত্রাণ নেই।

এমনতর বহুযুগব্যাপী অন্ধতার দিনে দেশ যখন নিশ্চলতাকেই পবিত্রতা বলে স্থির করে নিস্তব্ধ ছিল, এমন সময়েই ভারতবর্ষে রামমোহনের আবির্ভাব। দেশকালের সঙ্গে অকস্মাৎ এমন প্রকাণ্ড বৈপরীত্য ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটে। তাঁর দেশকাল তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করেছিল। সেই অসহিষ্ণু অস্বীকৃতির দ্বারাই দেশ তাঁর মহোচ্চতাকে সর্বকালের কাছে ঘোষণা করেছে। এই পরুষ কণ্ঠের গর্জনধ্বনির চেয়ে আর কোনো উপায়ে স্পষ্টতর করে বলা যায় না যে, তিনি এ দেশে অন্ধকারের বিপক্ষে আলোকের বিরোধ এনেছিলেন, তিনি অভ্যস্ত দুর্বল বচনের পুনরাবৃত্তি করে জড়বুদ্ধির অনুমোদন করেন নি; চাটুলুব্ধ জনতার খ্যাতি-গর্বিত অগ্রণীত্ব করার আত্মাবমাননাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন; তিনি উদ্যতদণ্ড জনসংঘের মূঢ় প্রতিকূলতাকে ভয় করেন নি, এবং তাদের নিবেদিত অন্ধ-ভক্তির প্রলোভনে সত্যপথ থেকে লেশমাত্র বিচলিত হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি বহুযুগের পূজাবেদিতে আসীন

জড়ত্বকে আঘাত করেছিলেন, এবং জড়ত্ব তাঁকে ক্ষমা করে নি।

তিনি জানতেন সকলপ্রকার জড়ত্বের মূলে আত্মার প্রতি অশ্রদ্ধা। জন্তু পায় নি তার স্বরাজ, কেননা সংস্কারের দ্বারা সে চালিত। জ্ঞানালোকিত আত্মা মানুষের ধর্মকে কর্মকে তার সৃষ্টিকে যে পরিমাণে অধিকার করে সেই পরিমাণেই তার স্বরাজ প্রসারিত হয়। সভ্যতার ইতিহাস মানুষের আত্মবুদ্ধি আত্মবিশ্বাস আত্মসম্মানের শক্তিতে স্বরাজ্যবিস্তারের ইতিহাস।

মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আত্মার জয়ঘোষণা একদিন এই ভারতবর্ষে যেমন অসংশয়িত বাণীতে প্রকাশ পেয়েছিল এমন আর কোথাও পায় নি। সেই বাণীই ভারতবর্ষে যখন খণ্ডিত আচ্ছন্ন অবরুদ্ধ তখনি রামমোহন রায় তাকে পুনরায় নূতন করে নির্মল করে বহন করে আনলেন। তার পূর্বেই অধিকাংশ ভারতবর্ষ নিজেকে নিকৃষ্ট অধিকারী বলে স্বীকার করে নিয়ে আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে জ্ঞানে কর্মে তামসিকতাকে অবলম্বন করে আত্মাবমাননায় নিমগ্ন ছিল। তার প্রথাজড়ত্বের-ব্যাধি-স্ফীত মন মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকারকে কেবল যে অঙ্গীকার করলে না তা নয়, তাকে ভর্ৎসনা করলে, আঘাত করলে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত দেশের ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যেই তিনি আত্মার বাণীকে উদ্‌বোধিত করতে চেয়েছিলেন এমন নয়। যে-কোনো সম্প্রদায়ই আপন জড় বাহ্য রূপের দ্বারা, জ্ঞানবিরোধী অন্ধ আচারের দ্বারা আপন

সত্যরূপকে আবৃত করেছে, তাকেই তিনি আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা বিচার করেছিলেন। তিনি মানুষের সমগ্রতাকে যেমন সমস্ত মনে প্রাণে অনুভব ও ব্যবহারে প্রকাশ করেছেন, সেই যুগে সমস্ত পৃথিবীতে অতি অল্প লোকের পক্ষেই তা সম্ভবপর ছিল। তিনি জানতেন কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই সকল ধর্মের মধ্যে মানুষের আত্মার মিলন ঘটতে পারে। তিনি জানতেন মানুষ যখন আপন ধর্মতত্ত্বের বাহ্য বেষ্টনীকে তার আত্মরূপের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছে, তখনি তাতে যেমন মানুষের ব্যবধান ঘটিয়েছে, তার ধর্মগত বিষয়বুদ্ধি অহংকার হিংসা বিদ্বেষ জাগিয়ে পৃথিবীকে রক্তে পঙ্কিল করেছে, এমন আর কিছুতেই করে নি। ধর্মের বিশ্বতত্ত্বের ভূমিকা তিনি সেই ধর্মসংকীর্ণতার দিনে আপন চিত্তের মধ্যে লাভ ও আপন জীবনের মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন।

যদিও সেদিন বাহির থেকে পৃথিবীর মানুষ প্রত্যেক সভ্য মানুষের জ্ঞানের মধ্যে স্থান পেয়েছিল, তার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে নি। মানুষের সম্বন্ধে বিশ্ববোধ আজও পৃথিবীতে নানা সংকীর্ণ সংস্কারে বাধাগ্রস্ত। আজও পৃথিবী এ কথা বলতে পাচ্ছে না যে, নূতন যুগ এল। সকল দিকেই এ যে অখণ্ডতার যুগ। এই যুগে জ্ঞানে কর্মে সব মানুষকে মিলিয়ে নেবার প্রশস্ত রাজপথ উদ্‌ঘাটিত হওয়া চাই। বিজ্ঞানরাজ্যে আজ জ্ঞানে জ্ঞানে অসবর্ণতা দূর করে মিলন আরম্ভ হয়েছে; বিশ্ববাণিজ্যের মধ্যে কর্মের মিলও বিস্তীর্ণ হল, যদিও সেই

মিলনপথের বাঁকে বাঁকে আজও বাটপাড়ির ব্যাবসা চলে ; যতই কঠিন বাধায় কণ্টকাকীর্ণ হোক, তবু বিশ্বরাষ্ট্রনীতির যে সূত্রপাত হয় নি এমন কথা বলা যায় না। এই নূতন যুগধর্মের উদ্‌বোধন বহন করে বাহিরের প্রতিকূলতা ও আত্মীয়ের লাঞ্ছনার মধ্যে যাঁরা এই পৃথিবীতে বুক পেতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের প্রথম ও প্রধানদের মধ্যেই রামমোহন একজন। তিনি ভারতবর্ষের সেই দূত যিনি সর্বপ্রথমে বিশ্বক্ষেত্রে ভারতের বাণীকে বহন করে নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন— সেই বাণী ভারতের স্বকীয় দৈন্য নিয়ে নয়, দুর্যোগ নিয়ে নয়, সমস্ত মানবের কাছে আপনার অর্ঘ্য নিয়ে। মানবসত্যকে তিনি সমগ্র করে দেখেছিলেন। তিনি যখন আপন ভাষায় বাঙালির আত্মপ্রকাশের উপাদানকে বলিষ্ঠ করবার জন্য প্রবৃত্ত ছিলেন তখন বাংলা গদ্য ভাষার অনুদ্‌ঘাটিত পথ তাঁকে প্রায় প্রথম থেকেই কঠিন প্রয়াসে খনন করতে হয়েছিল ; যখন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে বাঙালির মন উদ্‌ভাসিত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি সেই অপরিণত গদ্যে দুরূহ অধ্যবসায়ে এমন-সকল পাঠকের কাছে বেদান্তের ভাষ্য করতে কুণ্ঠিত হন নি যাদের কোনো কোনো পণ্ডিতও উপনিষদ্‌কে কৃত্রিম বলে উপহাস করতে সাহস করেছেন ও মহানির্বাণতন্ত্রকে মনে করেছিলেন রাম-মোহনেরই জাল-করা শাস্ত্র ; সমাজে নারীর অধিকার সমর্থন করতে একলা যখন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তখন পশ্চিম মহা-দেশেও নারী অবলাই ছিল এবং তার অধিকার ছিল সকল

দিকেই সংকীর্ণ; যখন তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বজাতির সম্মান দাবি করেছিলেন তখন দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূত্রপাতও হয় নি। মনুষ্যত্বের উপকরণ-বৈচিত্র্যকে তিনি তাঁর সকল শক্তি দিয়েই সম্মান করেছিলেন। মানুষকে তিনি কোনো দিকেই খর্ব করে দেখতে পারতেন না, কারণ তাঁর নিজের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা অসাধারণ ছিল।

এক শত বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখনো তাঁর সত্য পরিচয় দেশের কাছে অসম্পূর্ণ, এখনো তাঁকে অসম্মান করা দেশের লোকের কাছে অসম্ভব নয়; যে উদার দৃষ্টিতে তাঁর মহত্ত্ব সুস্পষ্ট দেখা যেত সে দৃষ্টি এখনো কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। কিন্তু, এতে সেই কুহেলিকার স্পর্ধার কোনো কারণ নেই। জ্যোতিষ্ককে আবৃত করে সমস্ত প্রভাতকে যদি সে ব্যর্থ করে দেয় তবু সেই জ্যোতিষ্ক কুহেলিকার চেয়ে ধ্রুব ও মহৎ। মহত্ত্ব বাহিরের কর্কশ বাধার মধ্যে থেকেও কাজ করে, আলোকের অনাদরে তার বিলুপ্তি হয় না। রামমোহন যে শক্তিকে চালনা করে গেছেন সেই শক্তি আজও কাজ করছে, এবং অবশেষে এমন দিন আসবে যখন তাঁর অবিচলিত প্রতিষ্ঠাকে, তাঁর বীর্যবান্ অপ্রতিহত মহিমাকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করবার মতো অন্ধসংস্কারমুক্ত সবল বুদ্ধি ও নির্বিকার শ্রদ্ধার অবস্থায় দেশ উত্তীর্ণ হবে। আমরা যারা তাঁর কাছ থেকে মানুষকে প্রচুর বিঘ্নের মধ্যে দিয়েও সত্য করে দেখবার প্রেরণা লাভ করি, তাঁর প্রত্যেক অসম্মানে আমরা মর্মাহত হই; কিন্তু তাঁর জীবিতকালেও শত

শত অবমাননাতেও তাঁর কল্যাণশক্তিকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন করে নি, এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও সকল অবজ্ঞার মধ্যে সেই শক্তি জাগ্রত থেকে অকৃতজ্ঞতার অন্তরে অন্তরেও সফলতার বীজ বপন করবে।

৬ ভাদ্র ১৩৩৫

৮

রাজা রামমোহনের কর্মজীবনের বৈচিত্র্য নানা দিকে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর জীবনের এই কর্মবৈচিত্র্য-বর্ণনায় আমি অসমর্থ। আমি কেবল তাঁর জীবনের একটি কথা আপনাদের নিকটে বলব। এ পর্যন্ত আমরা তাঁর স্মৃতিসভায় কেউ তাঁর রাজনীতি, কেউ শিক্ষা, কেউ সমাজসংস্কার এইরূপে খণ্ড খণ্ড করে তাঁর জীবনের এক-একটা দিক আলোচনা করেছি। এমন টুকরা টুকরা করে কোনো মহৎচরিত্র আলোচনা করা আমি অন্যায় বলে মনে করি, ইহাতে তাঁকে সম্মান না করে অপমান করা হয়। ঠিক আসল যে শক্তিটি তাঁর জীবনে সংগীতের মতো বেজে উঠেছিল তার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। বিশেষত যেখানে রাজা রামমোহনের মহত্ত্ব তাঁর সেই দিকটা বাদ দিয়ে আমরা যদি তাঁকে কেউ আট-আনা কেউ বারো-আনা স্বীকার করি তা হলে তাঁর অপমানই করা হবে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের হয় সম্মান করে ষোলো-আনা স্বীকার করতে হবে, না হয় অস্বীকার করে অপমানিত করতে হবে; এর মাঝামাঝি অন্য পথ নেই। আমি মনে করি সত্যকে স্বীকার করে রামমোহন তাঁর দেশবাসীর নিকটে তখন যে নিন্দা ও অসম্মান পেয়েছিলেন, সেই নিন্দা ও অপমানই তাঁর মহত্ত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিন্দা লাভ করেছিলেন সেই নিন্দাই তাঁর গৌরবের মুকুট। লোকে গোপনে তাঁর প্রাণবধেরও চেষ্টা করেছিল।

বৈদিক যুগে ঋষিরা এক সময়ে সূর্যকেই দেবতা বলে পূজা করতেন। আবার উপনিষদের ঋষি সেই সূর্যকেই বলেছেন, 'হে সূর্য, তুমি তোমার আবরণ অনাবৃত করো, তোমার মধ্যে আমরা সেই জ্যোতির্ময় সত্যদেবতাকে দেখি।'

সেকালে যতই পূজা, হোম, ক্রিয়া, অনুষ্ঠান থাকুক-না কেন, সেই-সকলের আবরণ ভেদ করে ঋষিরা সত্যকে দেখেছিলেন। যে ঈশোপনিষদে ঋষি সূর্যকে অনাবৃত হতে আহ্বান করেছেন সেই উপনিষদেরই প্রথম শ্লোক হচ্ছে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ॥

সকলই দেখতে হবে সেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন ক'রে, তাঁর দান ভোগ করতে হবে।

রাজা রামমোহন এই এককে, অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই এককেই তিনি দেশাচার লোকাচার প্রভৃতির জঞ্জাল হতে অনাবৃত ক'রে, কেবল বাঙালিকে নয়, ভারতবাসীকে নয়, পৃথিবীবাসীকে দেখালেন। তিনি তাঁকে জেনে প্রাচীন ঋষির মতো বললেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। তিনি সমস্ত আবরণের মধ্য হতে একে আবিষ্কার করেছেন। তিনি এক দিকে প্রাচীন ঋষি, আবার অন্য দিকে তিনি একেবারে আধুনিক, যতদূর

পর্যন্ত আধুনিক হওয়া যায় তিনি তাই। আগে এই বিশ্বাস ছিল এই ব্রহ্মকে সকলে জানতে পারে না। রামমোহন তাহা স্বীকার করলেন না, তিনি সকলকেই বললেন 'ভাব সেই একে'।

আজকের সভার এই প্রারম্ভসংগীত— 'ভাব সেই একে', ইহাই রামমোহনের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কথা।

যিনি যাহাতে বড়ো, তাঁকে সেই দিক দিয়ে সম্মান দেখাতে হয়; টাকায় বড়ো যিনি তিনি ধনী বলে সম্মান পান; বিদ্যায় বড়ো যিনি, তিনি বিদ্বান বলে সম্মান পান। রামমোহনকে সেই-সকল দিক দিয়ে দেখলে চলবে না; তিনি একেকে, সত্যকে লাভ করেছেন, সেই সত্যই তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। তাঁকে স্বীকার করেই তিনি নিন্দার মুকুট উপহার পেয়েছেন।

পৃথিবীর অন্য-সব মহাপুরুষের মতো তিনি টাকাকড়ি বিদ্যা খ্যাতি কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি, তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে সেই এককে সত্যকেই চেয়েছিলেন।

ভীষণ মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় একটা প্রস্রবণ প্রকাশ পায়। হোক-না সেটা মরুভূমি, তথাপি সেখানেও ধরিত্রীর বুকের ভিতরে প্রাণের রসধারা আছে; এই ধারা সর্বত্রই আছে। চারি দিকে শুষ্ক নির্জীব সমতল বালুর ক্ষেত্রের মধ্যে এই প্রস্রবণ একান্ত খাপছাড়া বলে মনে হবে সন্দেহ নাই। হয়তো চারি দিক বলবে, 'বেশ জড় নির্জীব শান্ত ছিলাম আমরা, হঠাৎ কোত্থেকে এল এই শ্যামলতা ও জলধারার কলধ্বনি!'

এই শুষ্ক নির্জীব দেশে মুক্তির বাণী ও জীবনের শ্যামলতা নিয়ে রামমোহন এসেছেন। আমরা জোর করে তাঁকে অস্বীকার করতে চাই, কিন্তু সাধ্য কী তাঁকে অস্বীকার করি। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই তাঁর জীবনধারা দেখতে পাই। আমরা এখন ফল পাচ্ছি, তাই অনায়াসে গাছের গোড়ার কথা অস্বীকার করছি। রামমোহন আমাদের কাছে আত্মার মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছেন। আমরা এখন বিদেশী কলকব্জা শিখতে চাই, পশ্চিমের অনুকরণে বাইরে থেকে অপকৃষ্ট উপায়ে স্বাধীনতা চাই। সে অসম্ভব। সকল শক্তির যেখানে মধ্যবিন্দু ও প্রাণের যেখানে কেন্দ্র, সেখান থেকে আমরা জীবনধারা লাভ করতে না পারলে আমরা বাইরের চেষ্টায় মুক্তি পাব না।

অনেকের এই ধারণা আছে পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই, তারা বস্তুতেই বড়ো হয়ে উঠেছে। আমি তা স্বীকার করি না। আধ্যাত্মিকতায় বড়ো না হয়ে মানুষ কিছুতেই বড়ো হতে পারে না। তাদের সেবা, তাদের প্রেম, তাদের ত্যাগের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা এ কথা কিছুতেই বলতে পারেন না যে, পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই।

রামমোহনকে সম্মান করতে হলে তাঁর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সত্যকে বরণ করতে হবে।

তাঁর জীবনের এই আসল কথাটিই আমার বক্তব্য। আর কিছু বলার সাধ্য আমার নেই।

১০ আশ্বিন ১৩২২

৯

একদা পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে অনেক সময়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে গাড়ি করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন; তিনি রামমোহন রায়ের সম্মুখবর্তী আসনে বসিয়া সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেন না, তাঁহার মুখচ্ছবিতে এমন একটি সুগভীর সুগম্ভীর সুমহৎ বিষাদ-চ্ছায়া সর্বদা বিরাজমান ছিল।

পিতার নিকট বর্ণনা-শ্রবণ-কালে রামমোহন রায়ের একটি অপূর্ব মানসী মূর্তি আমার মনে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাঁহার মুখশ্রীর সেই পরিব্যাপ্ত বিষাদমহিমা, বঙ্গদেশের সুদূর ভবিষ্যৎ-কালের সীমান্ত পর্যন্ত, স্নেহচিন্তাকুল কল্যাণকামনার কোমল রশ্মিজালরূপে বিকীর্ণ দেখিতে পাই। আমরা বঙ্গবাসী নানা সফলতা এবং বিফলতা, দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব, আশা এবং নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আপনার পথ নির্মাণ করিয়া চলিয়াছি। আমি দেখিতে পাইতেছি এখনো আমাদের প্রতি সেই নব্য-বঙ্গের আদিপুরুষ রামমোহন রায়ের দূরপ্রসারিত বিষাদদৃষ্টি নিস্তব্ধভাবে নিপতিত রহিয়াছে। এবং আমরা যখন আমাদের সমস্ত চেষ্টার অবসান করিয়া এই জীবলোকের কর্মক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইব, যখন নবতর বঙ্গবাসী নব নব শিক্ষা এবং চেষ্টা এবং আশার রঙ্গভূমি -মধ্যে অবতীর্ণ হইবে, তখনো রামমোহন রায়ের সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর বিষণ্ণবিশাল দৃষ্টি তাহাদের

সকল উদ্যোগের প্রতি আশীর্বাদ বিকীর্ণ করিতে থাকিবে। আমার পিতাকে যেদিন রামমোহন রায় সঙ্গে করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাইতেছিলেন সেদিন আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ইহসংসারে ছিলেন না— সেদিন যে পথ দিয়া তাঁহার শকট চলিয়াছিল অদ্য সে পথের মূর্তি-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তখন বঙ্গসমাজে একটি নূতন সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল— তখন পারস্য শিক্ষা অস্তপ্রায়, ইংরাজি শিক্ষার অরুণোদয় হইতেছে মাত্র, এবং সংস্কৃত শিক্ষা স্বল্পতৈল দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল আলোকের অপেক্ষা ভূরি পরিমাণে মলিন ধূম্র বিকীর্ণ করিতেছিল। তখনো বঙ্গসমাজের অভ্যুদয় হয় নাই ; তখন ছোটো ছোটো গ্রামসমাজ-পল্লিসমাজে বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইয়া ছিল ; ব্যক্তিবিশেষের জাতিকুল, কার্য অকার্য, বেতন এবং উপরিপ্রাপ্য সংকীর্ণ গ্রাম্যমণ্ডলীর সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল —এমন সময়ে একদিন রামমোহন রায় তাঁহার মহৎ প্রকৃতির, তাঁহার বৃহৎ সংকল্পের, সমস্ত অপরিমেয় বিষাদভার লইয়া আমার পিতাকে তাঁহাব স্বপ্রতিষ্ঠিত নববিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিতেছিলেন।

অদ্য ইংরাজি শিক্ষা দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, অদ্য বাংলাদেশের প্রভাতবিহঙ্গেরা ইংরাজি-অনুবাদ-মিশ্রিত সংগীতে দিগ্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন, উষাসমীরণে শত শত সংবাদপত্র ইংরাজি ও বাংলাভাষায় মর্মরধ্বনি তুলিয়া অবিরাম আন্দোলিত হইতেছে। তখন গদ্য বাক্যবিন্যাস

কী করিয়া বুঝিতে হয় রামমোহন রায় তাহা প্রথমে নির্দেশ করিয়া, তবে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আজ দেখিতে দেখিতে বঙ্গসাহিত্যলতা গদ্যে পদ্যে পাঠ্যে অপাঠ্যে কোথাও-বা কণ্টকিত কোথাও-বা মঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে— আজ সভা-সমিতি আবেদন-নিবেদন আলোচনা-আন্দোলন বাদ-প্রতিবাদে বঙ্গভূমি শুকপক্ষীকুলায়ের ন্যায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ফলত, বঙ্গসমাজপুরীর পুরাতন রাজপথের আজ অনেক নূতন সংস্কার হইয়া গিয়াছে, পথ এবং জনতা উভয়েরই বহুল পরিমাণে রূপান্তর দেখা যাইতেছে। কিন্তু, তথাপি আমি কল্পনা করিতেছি— যে শকটে রামমোহন রায় আমার পিতাকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন সেই শকটে অদ্য আমরা তাঁহার সম্মুখবর্তী আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছি না। দেখিতে পাইতেছি এখনো তাঁহার সমুন্নত ললাট ও উদার নেত্রযুগল হইতে সেই পুরাতন বিষাদচ্ছায়া অপনীত হয় নাই, এখনো তিনি ভবিষ্যতের দিগন্তাভিমুখে তাঁহার সেই গভীর চিন্তাবিষ্ট দূরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

হিমালয়ের দুর্গম নির্জন অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গমালার মধ্যে যে একটি নির্মল নিস্তব্ধ নিঃশব্দ তপঃপরায়ণ বিষাদ বিরাজ করে রামমোহন রায়ের বিষাদ সেই বিষাদ— তাহা অবসাদ নহে, নৈরাশ্য নহে; তাহা দূরগামী সংকল্প, দূরপ্রসারিত দৃষ্টি, সুদূরব্যাপী মহৎ প্রকৃতির ধ্যানধৈর্যের বিশালতা, অনন্ত স্বচ্ছ আকাশের

নীলিমা; অতলস্পর্শ নির্মল সরোবরে শ্যামলতা যেরূপ উজ্জ্বল তাঁহার বৃহৎ অন্তঃকরণের বিষাদ সেইরূপ জ্যোতির্ময়, সেইরূপ বহুদূরবিস্তীর্ণ। যে বঙ্গভূমি তাঁহার ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে নিয়ত প্রকাশ পাইতেছিল সে বঙ্গভূমি তখন কোথায় ছিল এবং এখনই বা কোথায় আছে! রামমোহন রায়ের সেই বঙ্গদেশ, তখনকার বঙ্গভূমির সমস্ত ক্ষুদ্রতা জড়তা সমস্ত তুচ্ছতা হইতে বহুদূরে পশ্চিমদিক্‌প্রান্তভাগে স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত মেঘমালার মধ্যে ছায়া-পুরীর মতো বিরাজ করিতেছিল। যখন বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ মূঢ়ের মতো তাঁহাকে গালি দিতেছিল তখন তিনি সেই মানস বঙ্গলোক হইতে দূরাগত সংগীতধ্বনির প্রতি কান পাতিয়া-ছিলেন; সমাজ যখন তাঁহাকে তিরস্কৃত করিবার উদ্দেশে আপন ক্ষুদ্র গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিতেছিল তখন তিনি প্রসারিত-বাহু বিশ্ববন্ধুর ন্যায় সেই মানস বঙ্গসমাজের নিত্য-উন্মুক্ত উদার জ্যোতির্ময় সিংহদ্বারের প্রতি আপন উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া-ছিলেন। সে সংগীত, সে দৃশ্য, ভবিষ্যতের সেই স্বর্গীয় আশারাজ্য যাহাদের সম্মুখে বর্তমান ছিল না, তাহারা তাঁহার সেই উদার ললাটের উপর সততসঞ্চরমাণ ছায়ালোকের কোনো অর্থই বুঝিতে পারিত না। তাহাদের আশা ছিল না, ভাষা ছিল না, সাহিত্য ছিল না, জাতিকে তাহারা বর্ণ বলিয়া জানিত, দেশ বলিতে তাহারা নিজের পল্লীকে বুঝিত; বিশ্ব তাহাদের গৃহকোণ-কল্পিত মিথ্যা বিশ্ব, সত্য তাহাদের অন্ধ সংস্কার; ধর্ম তাহাদের লোকাচারপ্রচলিত ক্রিয়াকর্ম, মনুষ্যত্ব কেবলমাত্র অনুগত-

প্রতিপালন এবং পৌরুষ রাজদ্বারে সৎ ও অসৎ উপায়ে উচ্চ বেতন-লাভ। রামমোহন রায় যদি কেবল ইহাদের মধ্যে আপনার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিতেন, যদি সেই সংকীর্ণ বর্তমান কালের মধ্যেই আপনার সমস্ত আশাকে প্রতিহত হইতে দিতেন, তাহা হইলে কদাচ কাজ করিতে পারিতেন না— তাহা হইলে তাঁহার মাতৃভূমিকে আপন আদর্শলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত।

যদিও একই পৃথিবী, একই মৃত্তিকা, তথাপি মহাপুরুষদিগের জন্মভূমি আমাদের হইতে অনেক স্বতন্ত্র। এই পৃথিবী, এই মৃত্তিকা আমাদের অজ্ঞাতসারে অদৃশ্যভাবে তাঁহাদের পদতলে বহু ঊর্ধ্বে উন্নত হইয়া উঠে। যখন তাঁহারা আমাদের সহিত এক সমভূমিতে সঞ্চরণ করিতেছেন তখনো তাঁহারা পর্বতের শিখরাগ্র-ভাগে আছেন; সেইজন্য তাঁহারা গৃহের মধ্যে থাকিয়াও বিশ্বকে দেখিতে পান, বর্তমানের মধ্যে থাকিলেও ভবিষ্যৎ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে থাকে, ইহলোকের মধ্যে থাকিয়াও পরলোক তাঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। আমরা ভূগোলবিদ্যার সাহায্যে জ্ঞানে জানি যে, আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীকে অতিক্রম করিয়াও বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা সেই উচ্চ ভূমিতে নাই যেখান হইতে বিশ্বলোকের সহিত প্রত্যহ প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। আমরা কল্পনার সাহায্যে আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টিকে ভবিষ্যৎ-অভিমুখে কিয়দ্দূর প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু আমরা সেই উন্নত লোকে বাস করি না যেখানে ভবিষ্যতের অনন্ত-আশ্বাস-সামগীতি বিশ্ব-

বিধাতার নীরব মাভৈঃশব্দের সহিত নিরন্তর বিচিত্র স্বরে সম্মিলিত হইতেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে পরলোকের প্রতি বিশ্বাসহীন নহি, কিন্তু আমরা সেই স্বাভাবিক সমুচ্চ আসনের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত নহি যেখান হইতে ইহলোক-পরলোকের জ্যোতির্ময় সংগমক্ষেত্র প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অন্তরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টি-গোচর হইতে থাকে। সেইজন্য আমাদের এত সংশয়, এত দ্বিধা; সেইজন্যই আমাদের সংকল্প এমন দুর্বল, আমাদের উদ্যম এমন স্বল্পপ্রাণ; সেইজন্যই বিশ্বহিতের উদ্দেশে আত্মসমর্পণ আমাদের নিকট একটি সুমধুর কাব্যকথা মাত্র, সেইজন্য ক্ষুদ্র বাধা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া মহাসফলতার অনন্ত বিস্তীর্ণ উর্বরক্ষেত্র আর আমরা দেখিতেই পাই না। মর্ত্যসুখ যখন স্বর্ণমায়ামৃগের মতো আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া ধাবমান করে তখন অমৃতলোক আমাদের নিকট হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। আমাদের নিকট সংসারের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, বর্তমানের উপস্থিত বাধা বিপত্তি, মর্ত্যসুখের বিচিত্র প্রলোভনই প্রত্যক্ষ সত্য, আর-সমস্ত শুনা কথা— শিক্ষালব্ধ মুখস্থবিদ্যা এবং ছায়াময় কল্পনা। কিন্তু, মহা-পুরুষদের নিকট আমাদের সেই-সকল ছায়ারাজ্য প্রত্যক্ষ সত্য; বস্তুত সেইখানেই তাঁহারা বাস করিতেছেন। আমাদের সংসার, আমাদের সুখদুঃখ, আমাদের বাধাবিপত্তি তাঁহাদিগকে চরম পরিণাম-স্বরূপে আবৃত করিয়া রাখে না।

রামমোহন রায় সেই মহাপুরুষ, যিনি বঙ্গদেশে অবতীর্ণ

হইয়াও বিধাতার প্রসাদে নিত্য সত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার শারীরিক জন্মস্থানের সহিত তাঁহার মানসিক জন্মভূমির বিরোধ তাঁহার সম্মুখে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তরে নিত্যসত্যের স্বাভাবিক আদর্শ, বাহিরে চতুর্দিকেই অসত্য প্রাচীন ভক্তিভাজন বেশে সঞ্চরণ করিতেছে। সেই অসত্যের সহিত তিনি কোনোক্রমেই সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন না। সেইজন্য দেশের বৃদ্ধেরা যখন প্রাণহীন ক্রিয়াকর্ম ও প্রথার মধ্যে জড়ত্বের শান্তিসুখ অনুভব করিতেছিল তখন বালক রামমোহন মরীচিকাভীরু তৃষাতুর মৃগশাবকের ন্যায় সত্যের অন্বেষণে দুর্গম প্রবাসে দেশদেশান্তরে ব্যাকুলভাবে পর্যটন করিতেছিলেন। কত লক্ষ লক্ষ লোক, যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার জড়সংস্কারের পুরাতন লূতাতন্তুজালের মধ্যে অনায়াসে নির্বিরোধে আত্মসমর্পণ করিয়া আশ্রয়লাভ করে, তদ্দারা অন্তরাত্মাকে খর্ব জীর্ণ জড়বৎ করিয়া রাখে, তাহা আমৃত্যুকাল জানিতেও পারে না— রামমোহন রায়ের আত্মা প্রথম হইতেই সেই-সকল জড় সংস্কারে জড়িত হইতে চাহিল না। নীড়চ্যুত তরুণ ঈগল্ পক্ষী যেমন স্বভাবতই পৃথিবীর সমস্ত নিম্নভূমি পরিহার করিয়া আপন অভ্রংলিহ শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয়, কিশোর রামমোহন রায় সেইরূপ বঙ্গসমাজের জীর্ণনীড় স্বভাবতই পরিত্যাগ করিয়া অভ্রভেদী অচলশিখর-প্রতিষ্ঠিত সত্য কুলায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। লোকাচার, সামাজিক সংস্কার, বহু পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু

সত্য তদপেক্ষা পুরাতন— সেই চিরপুরাতন সত্যের সহিত এই নবীন বাঙালি বালকের কোথায় পরিচয় হইয়াছিল? সেই সত্যের অভাবে গৃহবাস, সমাজের আশ্রয়, লৌকিক সুখশান্তি, এই গৃহপালিত তরুণ বাঙালির নিকটে কেমন করিয়া এত তুচ্ছ বোধ হইল? সেই ভূমা সত্যসুখের আস্বাদ সে কবে কোথায় লাভ করিয়াছিল? বঙ্গমাতা এই বালককে তাহার অন্যান্য শিশুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া আপনার চিরপ্রচলিত ক্রীড়নকগুলি তাহার সম্মুখে একে একে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল; বালক কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'ইহা নহে, ইহা নহে— আমি ধর্ম চাহি, ধর্মের পুত্তলি চাহি না; আমি সত্য চাহি, সত্যের প্রতিমা চাহি না।' বঙ্গমাতা কিছুতেই এই বালকটিকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না— সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সন্ধানে সে একাকী বিশ্বজগতে বাহির হইয়া গেল। সে কোন্-এক সময় কেমন করিয়া বাংলাদেশের সমস্ত দেশাচার-লোকাচারের উপরে মস্তক তুলিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, এই আচার-অনুষ্ঠানই চরম নহে, ইহার বাহিরে অসীম সত্য অনন্তকাল অমৃতপিপাসু ভক্ত মহাত্মাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। পূর্বেই বলিয়াছি মহাপুরুষদের পদতলে ধরণী অদৃশ্যভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষগোচর চরাচরের বহির্বর্তী অনন্ত দৃশ্য দেখাইয়া দেয়, তখন তাঁহারা বরঞ্চ নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিতে পারেন কিন্তু সেই বিশ্ববেষ্টনকারী দৃশ্যাতীত অনন্ত সত্যলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন না।

নারিকেলের বহিরাবরণের ন্যায় সকল ধর্মেরই বাহ্যিক অংশ তাহার অন্তরস্থিত অমৃতরসকে ন্যূনাধিক পরিমাণে গোপন ও দুর্লভ করিয়া রাখে। তৃষার্ত রামমোহন রায় সেই-সকল কঠিন আবরণ স্বহস্তে ভেদ করিয়া ধর্মের রসশস্য আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত শিখিয়া বেদ-পুরাণের গহন অরণ্যের মধ্যে আপনার পথ কাটিয়া লইলেন, হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখিয়া খৃস্টধর্মের মূল আকরের মধ্যে অবতরণ করিলেন, আরব্য ভাষা শিখিয়া কোরানের মূল মন্ত্রগুলি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া লইলেন। ইহাই সত্যের জন্য তপস্যা। সত্যের প্রতি যাহার প্রকৃত বিশ্বাস নাই সে বিনা চেষ্টায় যাহা হাতের কাছে প্রস্তুত দেখিতে পায় তাহাকেই আশ্রয় করিয়া অবহেলে জীবনযাপন করিতে চাহে—কর্তব্যবিমুখ অলস ধাত্রীর ন্যায় মোহ-অহিফেন-সেবনে অভ্যস্ত করাইয়া অন্তরাত্মার সমস্ত চেষ্টা সমস্ত ক্রন্দন নিরস্ত করিতে প্রয়াস পায় এবং জড়ত্বসাধনার দ্বারা আত্মাকে অভিভূত করিয়া সংসারাশ্রমে পরিপুষ্ট সুচিক্কণ হইয়া উঠে।

একদিন বহু সহস্র বৎসর পূর্বে সরস্বতীকূলে কোন্-এক নিস্তব্ধ তপোবনে কোন্-এক বৈদিক মহর্ষি ধ্যানাসনে বসিয়া উদাত্ত স্বরে গান গাহিয়া উঠিয়াছিলেন—

> শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রসকল, তোমরা শ্রবণ করো— আমি সেই তিমিরাতীত মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

রামমোহন রায়ও একদিন উষাকালে নির্বাণদীপ তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গসমাজের গাঢ়নিদ্রামগ্ন নিশ্চেতন লোকালয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন— হে মোহশয্যাশায়ী পুরবাসীগণ, আমি সত্যের দর্শন পাইয়াছি— তোমরা জাগ্রত হও!

লোকাচারের পুরাতন শুষ্ক পর্ণশয্যায় সুখসুপ্ত প্রাণীগণ রক্তনেত্র উন্মীলন করিয়া সেই জাগ্রত মহাপুরুষকে রোষদৃষ্টিদ্বারা তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু, সত্য যাহাকে একবার আশ্রয় করে সে কি আর সত্যকে গোপন করিতে পারে? দীপবর্তিকায় অগ্নি যখন ধরিয়া উঠে তখন সেই শিখা লুক্কায়িত করা প্রদীপের সাধ্যায়ত্ত নহে— আমরা রুষ্ট হই আর সন্তুষ্ট হই, সে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া জ্বলিতে থাকিবে, তাহার অন্য গতি নাই।

রামমোহন রায়েরও অন্য গতি ছিল না— সত্যশিখা তাঁহার অন্তরাত্মায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল— সমাজ তাঁহাকে যত লাঞ্ছনা যত নির্যাতন করুক, তিনি সে আলোক কোথায় গোপন করিবেন? তখন হইতে তাঁহার আর বিশ্রাম নাই, নিভৃতগৃহবাসসুখ নাই, বঙ্গসমাজের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে হইবে। তাঁহাকে সমস্ত বিরোধ বিদ্বেষ প্রতিকূলতার রোষগর্জনের ঊর্ধ্বে কণ্ঠ তুলিয়া বলিতে হইবে— মিথ্যা! মিথ্যা! হে পৌরগণ, ইহাতে মুক্তি নাই, ইহাতে তৃপ্তি নাই, ইহা ধর্ম নহে, ইহা আত্মার উপজীবিকা নহে, ইহা মোহ, ইহা মৃত্যু! মিথ্যাকে স্তূপাকার করিয়া তুলিলেও তাহা সত্য হয় না, তাহা মহৎ হয় না; সত্যের

প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে তবে সাবধানে জ্ঞানালোকে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া তবে তাহার পূজা করো— যে ভক্তি যেখানে-সেখানে অর্ঘ্য-উপহার স্থাপন করিয়া দ্রুত তৃপ্তি লাভ করিতে চায় সে ভক্তি আত্মার আলস্য, তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা তপস্যা নহে, তাহা যথার্থ আত্মোৎসর্গ নহে, তাহা অবহেলা, তাহাতে আত্মা বললাভ জ্যোতিলাভ মুক্তিলাভ করে না, কেবল উত্তরোত্তর জড়ত্বজালে জড়িত হইয়া সুপ্তিমগ্ন হইতে থাকে।

গ্রহণ করা এবং বর্জন করা জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। জীবনীশক্তি প্রবল থাকিলে এই গ্রহণবর্জনক্রিয়া অব্যাহত-ভাবে চলিতে থাকে; যখন ইহার ব্যাঘাত ঘটে তখন স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং মৃত্যু আসিয়া অধিকার করে।

আমাদের শারীর প্রকৃতিতে এই গ্রহণবর্জনক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া বহুলাংশে যন্ত্রবৎ চলিতে থাকে। আমরা অচেতনভাবে অম্লজান বায়ু গ্রহণ করি, অঙ্গারক বায়ু ত্যাগ করি; আমাদের দেহ প্রতিক্ষণে নূতন শারীর কোষ নির্মাণ করিতেছে এবং মৃত কোষ পরিত্যাগ করিতেছে— কী করিয়া যে তাহা আমরা জানি না।

আমাদের অন্তরপ্রকৃতিতেও বিচিত্র ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে গূঢ়ভাবে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সেখানে আমাদের কর্তৃত্বের অধিকার অপেক্ষাকৃত ব্যাপক এবং গুরুতরদায়িত্বপূর্ণ। ভালোমন্দ পাপপুণ্য শ্রেয়প্রেয় আমাদিগকে নিজের সতর্ক

চেষ্টায় গ্রহণ ও বর্জন করিতে হয়। ইহাতেই আত্মার মাহাত্ম্যও। এ কার্য যদি সম্পূর্ণ জড়বৎ যন্ত্রবৎ সম্পন্ন হইতে থাকিত তবে আমাদের মনুষ্যত্বের গৌরব থাকিত না— তবে ধর্ম ও নীতি শব্দ অর্থহীন হইত।

আত্মার গ্রহণ-বর্জন-কার্য এইরূপ স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করাতে অনেক সময়ে ইচ্ছা আপন কর্তব্য কার্য সতর্ক-ভাবে সম্পন্ন করে না; অনেক পুরাতন আবর্জনা সঞ্চিত হইতে থাকে, অনেক নূতন পোষণপদার্থ দূরে পরিত্যক্ত হয়। শরীর আপন মৃত কোষকে যেমন নির্মমভাবে বর্জন করে আমরা আমাদের মৃত বস্তুগুলিকে তেমন অকাতরে পরিহার করিতে পারি না, এইজন্য সকল মনুষ্যসমাজ এবং সকল ধর্মেরই চতুর্দিকে বহুযুগসঞ্চিত পরমপ্রিয় মৃতবস্তুগুলি উত্তরোত্তর স্তূপাকার হইয়া ক্রমে তাহার গতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়— অভ্যন্তরের বায়ুকে দূষিত করিয়া তোলে, বাহিরের স্বাস্থ্যকর বায়ুকে প্রবেশ করিতে দেয় না। যাহারা শনৈঃ শনৈঃ অলক্ষিত ভাবে এই বিষবায়ুর মধ্যে পালিত হইয়া উঠে তাহারা বুঝিতে পারে না যে, তাহারা কী আলোক কী স্বাস্থ্য কী মুক্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা মমত্ববশত ভস্মকে ত্যাগ করিতে পারে না, অবশেষে পবিত্র অগ্নি উত্তরোত্তর আচ্ছন্ন হইয়া কখন নির্বাপিত হইয়া যায় তাহা তাহারা জানিতেও পারে না।

ক্রমে এমন হয় যে যাহা মুখ্য বস্তু, যাহা সারপদার্থ, তাহা

লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া অনভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহার সহিত আর পরিচয় থাকে না, তাহাকে আমাদের আর একান্ত আবশ্যক বলিয়াই বোধ হয় না ; যাহা গৌণ, যাহা ত্যাজ্য, তাহাই পদে পদে আমাদের চক্ষুগোচর হইয়া অভ্যাসজনিত প্রীতি আকর্ষণ করিতে থাকে।

এমন সময়ে সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি বজ্রস্বরে বলেন, যে মিথ্যা সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে সেই মিথ্যাকে সত্য অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিয়ো না। তখন এই অতি পুরাতন কথা লোকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হয়। কেহ-বা বলে, 'সত্যকে মিথ্যা স্তূপের মধ্য হইতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার কষ্ট আমরা স্বীকার করিব না, আমরা যাহা সহজে পাই তাহাকেই সত্যজ্ঞানে সমাদর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছা করি।' অর্থাৎ, যাহা বর্জনীয় তাহা বর্জন করিতে চাহি না, যাহা গ্রহণীয় তাহাও গ্রহণ করিতে পারি না, আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছে। তখন সেই মহাপুরুষ বিধিপ্রেরিত উদ্যত বজ্রাগ্নি সেই মৃত আবর্জনাস্তূপের প্রতি নিক্ষেপ করেন। ধূর্জটি যখন মৃত সতীদেহ কোনোমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, নিষ্ফল মোহে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তখন বিষ্ণু আপন সুদর্শনচক্র-দ্বারা সেই মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া শিবকে মোহভার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেইরূপ মানব-সমাজকে মোহমুক্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষগণ

বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র লইয়া আবির্ভূত হন— সমাজ আপনার বহুকালের প্রিয় মোহভার হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে, কিন্তু দেবতার চক্রকে আপন কর্ম হইতে কে নিবৃত্ত করিতে পারে?

সর্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের দেশও তাহার ব্যতিক্রমস্থল নহে। বরঞ্চ যে জাতি সজীব সচেষ্ট, যাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, সবলভাবে কার্য করে, সানন্দমনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকে, যাহাদের সমাজে প্রাণের প্রবাহ কখনো অবরুদ্ধ থাকে না, তাহারা আপন গতিবেগের দ্বারা আপন ত্যাজ্য পদার্থকে বহুলাংশে দূরে লইয়া যায়, আপন দূষণীয়তা সংশোধন করিতে থাকে।

আমরা বহুকাল হইতে পরাধীন অধঃপতিত উৎপীড়িত জাতি; বহুদিন হইতে আমাদের সেই অন্তরের বল নাই যাহার সাহায্যে আমরা বাহিরের শত্রুকে বাহিরে রাখিতে পারি; সমাজের মধ্যে সেই জীবনীশক্তির ঐক্য নাই যদ্দ্বারা আমরা বিপৎকালে এক মুহূর্তে এক হইয়া গাত্রোত্থান করিতে পারি: আমাদের মধ্যে বহুকাল হইতে কোনো মহৎ সংকল্পসাধন কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নাই— সেইজন্য আমাদের অন্তরপ্রকৃতি ক্রমশ তন্দ্রামগ্ন হইয়া আসিয়াছিল। আমাদের হৃদয় রাজপুরুষদের অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচারিতায় দলিত নিস্তেজ, আমাদের অন্তঃকরণ বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক সানন্দ পরিচালনার অভাবে জড়বৎ হইয়া আসিয়াছিল। এমন স্থলে আমাদের

সমাজ আমাদের ধর্ম যে আপন আদিম বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা অক্ষুণ্ণ-ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। যদি রক্ষা করিত তবে সে উজ্জ্বলতা সকল অংশে সকল দিকেই প্রকাশ পাইত; তবে আমাদের মুখচ্ছবি মলিন, মেরুদণ্ড বক্র, মস্তক অবনত হইত না; তবে আমরা লোকসমাজে সর্বদা নির্ভীক-ভাবে অসংকোচে সঞ্চরণ করিতে পারিতাম। যাহার ধর্ম যাহার সমাজ সজীব সতেজ বিশুদ্ধ উন্নত, ত্রিভুবনে তাহার কাহাকেও ভয় করিবার নাই। বারুদ এবং সীসকের গোলক -দ্বারা তাহার স্বাধীনতা অপহৃত হইতে পারে না। আগে আমাদের সমাজ নষ্ট হইয়াছে, ধর্ম বিকৃত হইয়াছে, বুদ্ধি পরবশ হইয়াছে, মনুষ্যত্ব মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহার পরে আমাদের রাষ্ট্রীয় দুর্গতির সূচনা হইয়াছে। সকল অবমাননা সকল দুর্বলতার মূল সমাজের মধ্যে, ধর্মের মধ্যে।

রামমোহন রায় সেই সমাজ সেই ধর্মের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজের আদর্শ নহে। তিনি এ কথা বলিলেন না যে, আমার এই নূতনরচিত মত সত্য, আমার এই নূতন-উচ্চারিত আদেশ ঈশ্বরাদেশ। তিনি এই কথা বলিলেন —সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সতর্ক যুক্তি-দ্বারা সমাজের সমস্ত অকল্যাণ দূর করিতে হইবে। যেমন বলের দ্বারা ধূম নিরস্ত হয় না, অগ্নিকে সম্পূর্ণ প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলে ধূমরাশি আপনি অন্তর্হিত হয়— রামমোহন রায় সেইরূপ ধর্মের প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ অগ্নিকে প্রজ্বলিত জাগ্রত করিয়া তুলিয়া তাহার

ধূমজাল দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বেদ পুরাণ তন্ত্রের সারভাগ উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহার বিশুদ্ধ জ্যোতি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করিতে লাগিলেন। যে-সমস্ত নূতন কালিমা সেই পুরাতন জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাকে তিনি সেই জ্যোতির আদর্শের দ্বারাই নিন্দিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, হায়, আমাদের পক্ষে সেই পুরাতন জ্যোতিই নূতন, এই নূতন কালিমাই পুরাতন; সেই সনাতন বিশুদ্ধ সত্য শাস্ত্রের মধ্যে আছে, আর এই-সমস্ত অধুনাতন লোকাচার আমাদের ঘরে বাহিরে, আমাদের চিন্তায় কার্যে, আমাদের সুখে দুঃখে শত সহস্র চিহ্ন রাখিয়াছে— চক্ষু উন্মীলন করিলেই তাহাকে আমরা চতুর্দিকে দেখিতে পাই, শাস্ত্র উদ্‌ঘাটন না করিলে সনাতন সত্যের সাক্ষাৎ পাই না। অতএব, হে রামমোহন রায়, তুমি যে মুক্তা আহরণ করিয়াছ তাহা শ্রেয় হইতে পারে, কিন্তু যে শুক্তি যুক্তি-অস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিতেছ তাহাই আমাদের প্রেয়, আমাদের পরিচিত; আমরা মুক্তাকে মুখে বহুমূল্য বলিয়া সম্মান করিতে সম্মত আছি, কিন্তু শুক্তিখণ্ডকেই হৃদয়ের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিব।

তাহা হউক, সত্যকেও সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু, একবার যখন সে প্রকাশ পাইয়াছে তখন তাহার সহিতও আমাদের ক্রমশ পরিচয় হইবে। সত্যের পথ যদি বাধাগ্রস্ত না হয় তবে সত্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া চিনিয়া লইতে পারি না; সন্দেহের দ্বারা পীড়িত নিষ্পীড়িত করিয়া তবে

আমরা সত্যের অজেয় বল, অটল স্থায়িতা বুঝিতে পারি। যে প্রিয় পুরাতন মিথ্যা আমাদের গৃহে আমাদের হৃদয়ে এতকাল সত্যের ছদ্মবেশে বিরাজ করিয়া আসিয়াছে তাহাকে কি আমরা এক মুহূর্তের মধ্যে অকাতরে বিদায় দিতে পারি? সত্য যখন আপন কল্যাণময় কঠিন হস্তে তাহাকে আমাদের বক্ষ হইতে একেবারে কাড়িয়া ছিনিয়া লইয়া যাইবে তখন তাহার জন্য আমাদের হৃদয়ের শোণিতপাত এবং অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার পুরাতন প্রেয় বস্তুকে আপন শিথিল মুষ্টি হইতে অতি সহজেই ছাড়িয়া দিতে পারে সে লোক নূতন শ্রেয়কে তেমন সবলভাবে একান্তমনে ধারণ করিতে পারে না। পুরাতনের জন্য শোক যেখানে মৃদু, নূতনের জন্য আনন্দ সেখানে ম্লান। অবসন্ন রজনীর বিদায়-শিশিরাশ্রুজলের উপরেই প্রভাতের আনন্দ-অভ্যুদয় নির্মল উজ্জ্বল সুন্দর রূপে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে।

প্রথমে সকলেই বলিব, না না, ইহাকে চাহি না, ইহাকে চিনি না, ইহাকে দূর করিয়া দাও; তাহার পর একদিন বলিব, এসো এসো হে সর্বশ্রেষ্ঠ, এসো হে হৃদয়ের মহারাজ, এসো হে আত্মার জাগরণ, তোমার অভাবেই আমরা এতদিন জীবন্মৃত হইয়া ছিলাম।

এসো গো নূতন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব,
এসো গো ভীষণ শোভন।

এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এসো গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এসো গো চিত্তপাবন।
থাক্ বীণাবেণু, মালতীমালিকা,
পূর্ণিমানিশি, মায়াকুহেলিকা—
এসো গো প্রখর হোমানলশিখা
হৃদয়শোণিতপ্রাশন।
এসো গো পরমদুঃখনিলয়,
মোহ-অঙ্কুর করো গো বিলয়,
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়,
এসো গো মরণসাধন।

প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম বলিয়াই, যখন আবাহন করিব তখন একান্তমনে সমস্ত হৃদয়ের সঙ্গে করিব— প্রবল দ্বন্দ্বের পর পরাজয় স্বীকার করিয়া যখন আত্মসমর্পণ করিব তখন সম্পূর্ণরূপেই করিব, তখন আর ফিরিবার পথ রাখিব না।

আমাদের দেশে এখনো সত্যমিথ্যার সেই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বের অবতারণাই রামমোহন রায়ের প্রধান গৌরব। কারণ, যে সমাজে সত্যমিথ্যার মধ্যে কোনো বিরোধ নাই সে সমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়; এমন-কি, জড়ভাবে অন্ধভাবে সত্যকে গ্রহণ করিলেও সে সত্যের কোনো গৌরব থাকে না। সীতার ন্যায় সত্যকেও বারংবার অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করিতে হয়।

অনেকে মনে মনে অধৈর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, রাম-

মোহন রায় শাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া যে ধর্মকে বঙ্গসমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন এখনো তাহাকে সকলে গৃহে আহ্বান করিয়া লয় নাই ; এমন-কি, এক-এক সময় আশঙ্কা হয় সমাজ সহসা সবেগে তাহার বিপরীত মুখে ধাবিত হইতেছে, এবং রামমোহন রায়ের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। কিন্তু, সে আশঙ্কায় মুহ্যমান হইবার আবশ্যক নাই। রামমোহন রায় যে ধর্মকে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সে ধর্মকে তিনি সত্য বলিয়া জানিয়াছিলেন— আমরাও অগ্রে সে ধর্মকে প্রকৃতরূপে সত্য বলিয়া জানিব তবে তাহাকে গ্রহণ করিব ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়, সত্যকে কেবল পঠিত মন্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিব না।

সত্যকে যথার্থ সত্য বলিয়া জানা সহজ নহে— অনেকে যাঁহারা মনে করেন 'জানিয়াছি' তাঁহারাও জানেন না। রাম-মোহন রায় যে নিদারুণ পিপাসার পর যে কঠোর তপস্যার দ্বারা ধর্মে বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন আমাদের সে পিপাসাও নাই, সে তপস্যাও নাই ; আমরা কেবল পরম্পরাগত বাক্য শ্রবণ করিয়া যাই এবং মনে করি যে তাহা সত্য এবং তাহা বুঝিলাম। কিন্তু, আমাদের অন্তরাত্মা আকাঙ্ক্ষা-দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার সমস্ত সত্যতা একান্তভাবে লাভ করে না।

এখনো আমাদের বঙ্গসমাজে সেই আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসার সঞ্চার হয় নাই, সত্যধর্মের জন্য আমাদের প্রাণের দায় উপস্থিত হয় নাই ; যে ধর্ম স্বীকার করি সে ধর্ম বিশ্বাস না করিলেও

আমাদের চলে, যে ধর্মে বিশ্বাস করি সে ধর্ম গ্রহণ না করিলেও আমাদের ক্ষতিবোধ হয় না— আমাদের ধর্মজিজ্ঞাসার সেই স্বাভাবিক গভীরতা নাই বলিয়া সে সম্বন্ধে আমাদের এমন অবিনয়, এমন চাপল্য, এমন মুখরতা। কোনো সন্ধান, কোনো সাধনা না করিয়া, অন্তরের মধ্যে কোনো অভাব অনুভব বা কোনো অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া, এমন অনায়াসে কোনো-এক বিশেষ পক্ষ অবলম্বন-পূর্বক উকিলের মতো নিরতিশয় সূক্ষ্ম তর্ক করিয়া যাইতে পারি। এমন করিয়া কেহ আত্মার খাদ্য পানীয় আহরণ করে না। ইহা জীবনের সর্বোত্তম ব্যাপার লইয়া বাল্যক্রীড়া মাত্র।

দীর্ঘ সুপ্তির পর রামমোহন রায় আমাদিগকে নিদ্রোত্থিত করিয়া দিয়াছেন। এখন কিছুদিন আমাদের চিত্তবৃত্তির পরিপূর্ণ আন্দোলন হইলে পর তবে আমাদের আত্মার স্বাভাবিক সত্যক্ষুধা সঞ্চার হইবে— তখনি সে যথার্থ সত্যকে সত্যরূপে লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

রামমোহন রায় এখন আমাদিগকে সেই সত্যলাভের পথে রাখিয়া দিয়াছেন। প্রস্তুত সত্য মুখে তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা এই সত্যলাভের পথে স্থাপন করা বহুগুণে শ্রেয়। এখন আমরা বহুকাল অলীক জল্পনা, নাস্তিক্যের অভিমান, বৃথা তর্কবিতর্ক এবং বহুবিধ কাল্পনিক যুক্তির মধ্যে অবিশ্রাম নৃত্য করিয়া ফিরিব; ধর্মের নানারূপ ক্রীড়ায় প্রভাত অতিবাহন করিব; অবশেষে সূর্য যখন মধ্যগগনে অধিরোহণ করিবে, যখন

অন্তঃকরণ অমৃতসরোবরে সুধাস্নানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, ক্ষুধিত পিপাসিত অন্তরাত্মা তখন দেখিতে পাইবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক বিস্তার করিয়া শ্রান্তি বৈ পরিতৃপ্তি নাই— তখন যথার্থ অনুসন্ধান পড়িয়া যাইবে এবং যতক্ষণ আত্মার যথার্থ খাদ্যপানীয় না পাইব ততক্ষণ আপনাকে বৃথা বাক্যের ছলনায় ভুলাইয়া রাখিতে পারিব না। তখন রামমোহন রায় আত্মার স্বাধীন চেষ্টার যে রাজপথ বাঙালিকে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন সেই পথযাত্রা সার্থক হইবে এবং তখন রামমোহন রায়ের সেই শকট আপন গম্যস্থানে আত্মার বিদ্যামন্দিরে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

রামমোহন রায় তাঁহার যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদের বঙ্গানু-বাদের ভূমিকায় যে প্রার্থনা করিয়াছেন আমরাও সেই প্রার্থনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

'হে অন্তর্যামিন্, পরমেশ্বর, আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী এবং সর্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ কর ইতি। ওঁ তৎসৎ।'

আশ্বিন ? ১৩০৩

১০

মহাপুরুষেরা সমস্ত মানবজাতির গৌরবের ও আদর্শের স্থল বটেন, কিন্তু তাঁহারা জাতিবিশেষের বিশেষ গৌরবের স্থল তাহার আর সন্দেহ নাই। গৌরবের স্থল বলিলে যে কেবলমাত্র সামান্য অহংকারের স্থল বুঝায় তাহা নহে গৌরবের স্থল বলিলে শিক্ষার স্থল, বললাভের স্থল বুঝায়। মহাপুরুষদিগের মহৎকার্য-সকল দেখিয়া কেবলমাত্র সম্ভ্রমমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হইলেই যথেষ্ট ফললাভ হয় না— তাঁহাদিগকে যতই 'আমার' মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি যতই প্রেমের উদ্রেক হয় ততই তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের কার্য, তাঁহাদের চরিত্র আমাদের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠে যাঁহাদিগকে লইয়া আমরা গৌরব করি তাঁহাদিগকে শুদ্ধমাত্র যে আমরা ভক্তি করি তাহা নহে, তাঁহাদিগকে 'আমার' বলিয়া মনে করি। এইজন্য তাঁহাদের মহত্ত্বের আলোক বিশেষরূপে আমাদেরই উপরে আসিয়া পড়ে, বিশেষরূপে আমাদেরই মুখ উজ্জ্বল করে। শিশু যেমন সহস্র বলবান ব্যক্তিকে ফেলিয়া বিপদের সময় পিতার কোলে আশ্রয় লইতে যায়, তেমনি আমরা দেশের দুর্গতির দিনে আর-সকলকে ফেলিয়া আমাদের স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের অটল আশ্রয় অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তখন আমাদের নিরাশ হৃদয়ে তাঁহারা যেমন বলবিধান করিতে পারেন এমন আর কেহই নহে। ইংলণ্ডের দুর্গতি কল্পনা করিয়া কবি

ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থ্‌ পৃথিবীর আর-সমস্ত মহাপুরুষকে ফেলিয়া কাতর স্বরে মিল্টনকেই ডাকিলেন ; কহিলেন, 'মিল্টন, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে ! তোমাকে ইংলণ্ডের বড়োই আবশ্যক হইয়াছে।' যে জাতির মধ্যে স্বদেশীয় মহাপুরুষ জন্মান নাই সে জাতি কাহার মুখ চাহিবে— তাহার কী দুর্দশা ! কিন্তু, যে জাতির মধ্যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি যে জাতি কল্পনার জড়তা, হৃদয়ের পক্ষাঘাত -বশত, তাঁহার মহত্ত্ব কোনোমতে অনুভব করিতে পারে না, তাহার কী দুর্ভাগ্য !

আমাদের কী দুর্ভাগ্য ! আমরা বঙ্গসমাজের বড়ো বড়ো যশোবুদ্‌বুদদিগকে বালুকার সিংহাসনের উপর বসাইয়া দুই দিনের মতো পুষ্পচন্দন দিয়া মহত্ত্বপূজার স্পৃহা খেলাচ্ছলে চরিতার্থ করিতেছি, বিদেশীয়দের অনুকরণে কথায় কথায় সভা ডাকিয়া চাঁদা তুলিয়া মহত্ত্বপূজার একটা ভান ও আড়ম্বর করিতেছি।

রামমোহন রায়ের চরিত্র আলোচনা করিবার একটি গুরুতর আবশ্যকতা আছে। আমাদের এখনকার কালে তাঁহার মতো আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা কাতর স্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি, 'রামমোহন রায়, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে ! তোমাকে বঙ্গদেশের বড়োই আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বাক্‌পটু লোক, আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও। আমরা আত্মম্ভরী, আমাদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে শিখাও। আমরা লঘুপ্রকৃতি, বিপ্লবের স্রোতে চরিত্রগৌরবের

প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা বাহিরের প্রখর আলোকে অন্ধ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ চিরোজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে ভালোমন্দ নির্বাচন করিতে ও স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও।'

রামমোহন রায় যথার্থ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে প্রগল্‌ভা রসনার এত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং তাহার এত সমাদরও ছিল না। কিন্তু আর-একটা কথা দেখিতে হইবে। এক-একটা সময়ে কাজের ভিড় পড়িয়া যায়, কাজের হাট বসিয়া যায়, তখন কাজ করিতে অথবা কাজের ভান করিতে একটা আমোদ আছে। তখন সেই কার্যাড়ম্বর নাট্যরস জন্মাইয়া মানুষকে মত্ত করিয়া তুলে; বিশেষত একটা তুমুল কোলাহলে সকলে বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া একপ্রকার বিহ্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে বঙ্গসমাজের সে অবস্থা ছিল না। তখন কাজে মত্ততাসুখ ছিল না; একাকী ধীরভাবে সমস্ত কাজ করিতে হইত। সঙ্গীহীন সুগম্ভীর সমুদ্রের গর্ভে যেমন নীরবে অতি ধীরে ধীরে দ্বীপ নির্মিত হইয়া উঠে, সংকল্প তেমনি অবিশ্রাম নীরবে গভীর হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া কার্য-আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। মহত্ত্বের প্রভাবে, হৃদয়ের অনুরাগের প্রভাবে কাজ না করিলে, কাজ করিবার আর কোনো প্রবর্তনাই তখন বর্তমান ছিল না। অথচ কাজের ব্যাঘাত এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ছিল। রামমোহন রায়ের যশের প্রলোভন কিছুমাত্র ছিল না। তিনি যতগুলি কাজ করিয়াছিলেন কোনো কাজেই তাঁহার

সমসাময়িক স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে যশের প্রত্যাশা করেন নাই। নিন্দাগ্লানি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপরে অবিশ্রাম বর্ষিত হইয়াছে— তবুও তাঁহাকে তাঁহার কার্য হইতে বিরত করিতে পারে নাই। নিজের মহত্ত্বে তাঁহার কী অটল আশ্রয় ছিল, নিজের মহত্ত্বের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের কী সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ছিল, স্বদেশের প্রতি তাঁহার কী স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল। তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই, তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন, তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্মস্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীড়ন তাহাতেও সে বন্ধন বিছিন্ন হয় নাই। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ-আত্মবিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কী না করিয়াছিলেন! শিক্ষা বলো, রাজনীতি বলো, বঙ্গভাষা বলো, বঙ্গসাহিত্য বলো, সমাজ বলো, ধর্ম বলো, বঙ্গসমাজের যে-কোনো বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র। বঙ্গ-সমাজের সর্বত্রই তাঁহার স্মরণস্তম্ভ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে; তিনি এই মরুস্থলে যে-সকল বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহারা বৃক্ষ হইয়া শাখাপ্রশাখায় প্রতিদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।

তাহারই বিপুল ছায়ায় বসিয়া আমরা কি তাঁহাকে স্মরণ করিব না!

তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়; আবার তিনি যাহা না করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরো প্রকাশ পায়। তিনি যে এত কাজ করিয়াছেন কিছুরই মধ্যে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নিজের অথবা আর-কাহারো প্রতিমূর্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি গড়িয়া পিটিয়া একটা নূতন ধর্ম বানাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া পুরাতন ধর্ম প্রচার করিলেন। তিনি নিজেকে গুরু বলিয়া চালাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া প্রাচীন ঋষিদিগকে গুরু বলিয়া মানিলেন। তিনি তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহার প্রতিকূলতা করিয়াছেন। এরূপ আত্মবিলোপ এখন তো দেখা যায় না। বড়ো বড়ো সংবাদপত্র-পুট পরিপূর্ণ করিয়া অবিশ্রাম নিজের নামসুধাপানে একপ্রকার মত্ততা জন্মাইয়া আমাদের কাজের উৎসাহ জাগাইয়া রাখিতে হয় —দেশের জন্য যে সামান্য কাজটুকু করি তাহাও বিদেশী আকারে সমাধা করি, চেষ্টা করি যাহাতে সে কাজটা বিদেশীয়দের নয়ন-আকর্ষণ পণ্যদ্রব্য হইয়া উঠে। স্তুতিকোলাহল ও দলস্থ লোকের অবিশ্রাম একমন্ত্রোচ্চারণশব্দে বিব্রত থাকিয়া স্থিরভাবে কোনো বিষয়ের যথার্থ ভালোমন্দ বুঝিবার শক্তিও থাকে না, ততটা

ইচ্ছাও থাকে না, একটা গোলযোগের আবর্তের মধ্যে মহানন্দে ঘুরিতে থাকি ও মনে করিতে থাকি বিদ্যুৎ-বেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি।

আমরা যে আত্মবিলোপ করিতে পারি না তাহার কারণ, আমরা আপনাকে ধারণ করিতে পারি না। সামান্য মাত্র ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইলেই আমরাই সর্বোপরি ভাসিয়া উঠি। আত্মগোপন করিতে পারি না বলিয়াই সর্বদা ভাবিতে হয় আমাকে কেমন দেখিতে হইতেছে। যাঁহারা মাঝারি রকমের বড়ো লোক তাঁহারা নিজের শুভসংকল্প সিদ্ধ করিতে চান বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে আপনাকেও প্রচলিত করিতে চান। এ বড়ো বিষম অবস্থা। আপনিই যখন আপনার সংকল্পের প্রতিযোগী হইয়া উঠে তখন সংকল্পের অপেক্ষা আপনার প্রতি আদর স্বভাবতই কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়ে। তখন সংকল্প অনেক সময়ে হীনবল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কথায় কথায় তাহার পরিবর্তন হয়। কিছু-কিছু ভালো কাজ সম্পন্ন হয়, কিন্তু সর্বাঙ্গসুন্দর কাজটি হইয়া উঠে না। যে আপনার পায়ে আপনি বাধাস্বরূপ বিরাজ করিতে থাকে, সংসারে সহস্র বাধা সে অতিক্রম করিবে কী করিয়া? যে ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সংসারের মধ্যস্থলে নিজের শুভকার্য স্থাপন করে, সে স্থায়ী ভিত্তির উপরে নিজের মঙ্গলসংকল্প প্রতিষ্ঠিত করে। আর, যে নিজের উপরেই সমস্ত কার্যের প্রতিষ্ঠা করে, সে যখন চলিয়া যায় তাহার অসম্পূর্ণ কার্যও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়; যদি-বা বিশৃঙ্খল

ভগ্নাবশেষ ধূলির উপরে পড়িয়া থাকে তবে তাহার ভিত্তি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রামমোহন রায় আপনাকে ভুলিয়া নিজের মহতী ইচ্ছাকে বঙ্গসমাজের মধ্যে রোপণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি না থাকিলেও আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা সজীবভাবে প্রতিদিন বঙ্গসমাজের চারি দিকে অবিশ্রাম কাজ করিতেছে। সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার স্মৃতি হৃদয়পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার সেই অমর ইচ্ছার বংশ বঙ্গসমাজ হইতে বিলুপ্ত করিতে পারে না।

রামমোহন রায়ের আত্মধারণাশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল তাহা কল্পনা করিয়া দেখুন। অতি বাল্যকালে যখন তিনি হৃদয়ের পিপাসায় ভারতবর্ষের চতুর্দিকে আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহার অন্তরে বাহিরে কী সুগভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল! যখন এই মহানিশীথিনীকে মুহূর্তে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রখর আলোক দীপ্ত হইয়া উঠিল তখন তাহাতে তাঁহাকে বিপর্যস্ত করিতে পারে নাই। সে তেজ, সে আলোক তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অন্ধকারময় অঙ্গারের খনিতে যদি বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে তবে সে কী কাণ্ডই উপস্থিত হয়, ভূগর্ভ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তেমনি সহসা জ্ঞানের নূতন উচ্ছ্বাস কয়জন সহজে ধারণ করিতে পারেন? কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত মহৎ ছিলেন, এইজন্য এই জ্ঞানের বন্যায় তাঁহার হৃদয় অটল ছিল; এই জ্ঞানের বিপ্লবের মধ্যে মাথা তুলিয়া যাহা আমাদের দেশে ধ্রুব মঙ্গলের

কারণ হইবে তাহা নির্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন। এ সময়ে ধৈর্যরক্ষা করা যায় কি? আজিকার কালে আমরা তো ধৈর্য কাহাকে বলে জানিই না। কিন্তু রামমোহন রায়ের কী অসামান্য ধৈর্যই ছিল! তিনি আর-সমস্ত ফেলিয়া পর্বতপ্রমাণ স্তূপাকার ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন যে অগ্নি, ফুৎকার দিয়া তাহাকেই প্রজ্বলিত করিতে চাহিয়াছিলেন; তাড়াতাড়ি চমক লাগাইবার জন্য বিদেশী দেশালাইকাঠি জ্বালাইয়া জাদুগিরি করিতে চাহেন নাই। তিনি জানিতেন ভস্মের মধ্যে যে অগ্নিকণিকা অবশিষ্ট আছে তাহা ভারতবাসীর হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে নিহিত, সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে আর নিভিবে না।

রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মিথ্যা ও মৃত্যু-নামক মায়াবী রাজাদের প্রকৃত বল নাই, অমোঘ অস্ত্র নাই, কোথাও তাহাদের দাঁড়াইবার স্থল নাই, কেবল নিশীথের অন্ধকার ও একপ্রকার অনির্দেশ্য বিভীষিকার উপরে তাহাদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অজ্ঞান, আমাদের হৃদয়ের দুর্বলতাই তাহাদের বল। অতি বড়ো ভীরুও প্রভাতের আলোকে প্রেতের নাম শুনিলে হাসিতে পারে, কিন্তু অন্ধকার নিশীথিনীতে একটি শুষ্ক পত্রের শব্দ, একটি তৃণের ছায়াও অবসর পাইয়া আমাদের হৃদয়ে নিষ্ঠুর আধিপত্য করিতে থাকে। যথার্থ দস্যুভয় অপেক্ষা সেই মিথ্যা অনির্দেশ্য ভয়ের শাসন প্রবলতর।

অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন নিরুপায়, যেমন অসহায়, এমন আর কোথায়? রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল। তাহার জীবন নাই, অস্তিত্ব নাই, কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র। সেই নিশীথে, শ্মশানে, সেই ভয়ের বিপক্ষে 'মা ভৈঃ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া যিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মাহাত্ম্য আমরা আজিকার এই দিনের আলোকে হয়তো ঠিক অনুভব করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি সর্পবধ করিতে অগ্রসর হয় তাহার কেবলমাত্র জীবনের আশঙ্কা থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তুসর্প মারিতে যায় তাহার জীবনের আশঙ্কার অপেক্ষা অনির্দেশ্য অমঙ্গলের আশঙ্কা বলবত্তর হইয়া উঠে। তেমনি রামমোহন রায়ের সময়ে হিন্দুসমাজের ভগ্নভিত্তির সহস্র ছিদ্রে সহস্র বাস্তু-অমঙ্গল উত্তরোত্তর পরিবর্ধমান বংশ-পরম্পরা লইয়া প্রাচীনতা ও জড়তার প্রভাবে অতিশয় স্থূলকায় হইয়া উঠিতেছিল। রামমোহন রায় সমাজকে এই সহস্র নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু, এই নিদারুণ বন্ধন অনুরাগবন্ধনের ন্যায় সমাজকে জড়াইয়াছিল, এইজন্য সমস্ত বঙ্গসমাজ আর্তনাদ করিয়া রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করিল। আজি আমাদের বালকেরাও সেই-সকল মৃতসর্পের উপরে হাস্যমুখে পদাঘাত করে, আমরা তাহাদিগকে নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ বলিয়া উপহাস

করি— ইহাদের প্রবল প্রতাপ, ইহাদের চক্ষের মোহ-আকর্ষণ, ইহাদের সুদীর্ঘ লাঙ্গুলের ভীষণ আলিঙ্গনের আশঙ্কা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

একবার ভাঙচুর করিতে আরম্ভ করিলে একটা নেশা চড়িয়া যায়। সৃজনের যেমন আনন্দ আছে প্রলয়ের তেমনি একপ্রকার ভীষণ আনন্দ আছে। যাঁহারা রাজনারায়ণবাবুর 'এ কাল ও সে কাল' পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন নূতন ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙালি ছাত্রেরা যখন হিন্দুকালেজ হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহাদের কিরূপ মত্ততা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গুরুতর আঘাতে হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া, তাহাই লইয়া প্রকাশ্য পথে আবীর খেলাইতেন। কঠোর অট্টহাস্য ও নিষ্ঠুর উৎসবের কোলাহল তুলিয়া তখনকার শ্মশানদৃশ্য তাঁহারা আরো ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হিন্দুসমাজের কিছুই ভালো কিছুই পবিত্র ছিল না: হিন্দুসমাজের যে-সকল কঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাদের ভালোরূপ সংকার করিয়া শেষ ভস্মমুষ্টি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া বিষণ্নমনে যে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের ততটুকুও শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কালভৈরবের অনুচর ভূতপ্রেতের ন্যায় শ্মশানের নর-কপালে মদিরা পান করিয়া বিকট উল্লাসে উন্মত্ত হইতেন। সে সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের ততটা দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম বিপ্লবের সময় এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

একবার ভাঙিবার দিকে মন দিলে প্রলয়ের আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে। সে সময়ে খানিকটা খারাপ লাগিলেই সমস্তটা খারাপ লাগে, বাহিরটা খারাপ লাগিলেই ভিতরটা খারাপ লাগে। কিন্তু বর্তমান বঙ্গসমাজে বিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস সর্বপ্রথমে যিনি উৎসারিত করিয়া দিলেন, সেই রামমোহন রায়, তাঁহার তো এরূপ মত্ততা জন্মে নাই। তিনি তো স্থিরচিত্তে ভালোমন্দ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি আলোক জ্বালাইয়া দিলেন কিন্তু চিতালোক তো জ্বালান নাই। ইহাই রামমোহন রায়ের প্রধান মহত্ত্ব। কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান ও জীবনহীন তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যে জীবন্তে সমাহিত হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিলেন। যে মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম দিন দিন অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল যে জড়পাষাণস্তূপে পিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্মের হৃদয় হতচেতন হইয়া পড়িতেছিল, সেই মৃতভারে, সেই জড়স্তূপে রামমোহন রায় প্রচণ্ড বলে আঘাত করিলেন— তাহার ভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল— তাহার আপাদমস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। হিন্দুধর্মের বিপুলায়তন প্রাচীন মন্দির জীর্ণ হইয়া প্রতিদিন ভাঙিয়া পড়িতেছিল, অবশেষে হিন্দুধর্মের দেবপ্রতিমা আর দেখা যাইতেছিল না, কেবল মন্দিরেরই কাষ্ঠলোষ্ট্রধূলিস্তূপ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার গর্ভের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল, ছোটোবড়ো নানাবিধ সরীসৃপগণ গুহা নির্মাণ করিতেছিল, তাহার ইতস্তত প্রতিদিন কণ্টকাকীর্ণ গুল্মসকল উদ্ভিন্ন হইয়া সহস্র শিকড়ের দ্বারা নূতন নূতন বন্ধনে

সেই পুরাতন ভগ্নাবশেষকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুসমাজ দেবপ্রতিমাকে ভুলিয়া এই জড়-স্তূপকে পূজা করিতেছিল ও পর্বতপ্রমাণ জড়ত্বের তলে পড়িয়া প্রতিদিন চেতনা হারাইতেছিল। রামমোহন রায় সেই ভগ্ন-মন্দির ভাঙিলেন। সকলে বলিল তিনি হিন্দুধর্মের উপরে আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এইজন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। কী সংকটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন! তাঁহার এক দিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর-এক দিকে বিদেশীয় সভ্যতাসাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুৎ-বেগে অগ্রসর হইতেছিল— রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খৃস্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মতো মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।

এইখানে রামমোহন রায়ের উদারতা সম্বন্ধে হয়তো দু-একটা কথা উঠিতে পারে। ভস্মস্তূপের মধ্যে ঋষিদের হৃদয়জাত যে অমর অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল, ভস্ম উড়াইয়া দিয়া তিনি তাহাই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু, এত করিবার কী প্রয়োজন ছিল? তাহার উত্তর এই— বিজ্ঞান-দর্শনের ন্যায় ধর্ম যদি কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইত— হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার, লাভ করিবার, সঞ্চয় করিবার বিষয় না হইত— ধর্ম যদি গৃহের

অলংকারের ন্যায় কেবল গৃহভিত্তিতে ঝুলাইয়া রাখিবার সামগ্রী হইত, আমাদের সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজের প্রবর্তক নিবর্তক না হইত— তাহা হইলে এরূপ না করিলেও চলিত; তাহা হইলে নানাবিধ বিদেশী অলংকারে গৃহ সাজাইয়া রাখা যাইত ; কিন্তু ধর্ম নাকি হৃদয়ে পাইবার ও সংসারের কাজে ব্যবহার করিবার দ্রব্য, দূরে রাখিবার নহে, এইজন্যই স্বদেশের ধর্ম স্বদেশের জন্য বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম। অন্য কোনো দেশের লোকে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, ব্রহ্ম বলিতে আমরা ঈশ্বরকে যেরূপ ভাবে বুঝি ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় নামে বিদেশীয়েরা কখনোই তাহাকে ঠিক সেরূপ ভাবে বুঝে না। বুঝে বা না বুঝে জানি না, কিন্তু ব্রহ্ম বলিতে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইবে ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনোই উদয় হইবে না। ব্রহ্ম একটি কথার কথা নহে— যে ইচ্ছা পাইতে পারে না, যাহাকে ইচ্ছা দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের পিতামহদের অনেক সাধনার ধন ; সমস্ত সংসার বিসর্জন দিয়া, সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়া, নিভৃত অরণ্যে ধ্যানধারণা করিয়া আমাদের ঋষিরা আমাদের ব্রহ্মকে পাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী। আর-কোনো জাতি ঠিক এমন সাধনা করে নাই, ঠিক এমন অবস্থায় পড়ে নাই, এইজন্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক জাতি বিশেষ

সাধনা -অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল তাহারা অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছাপূর্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব ?

উদ্ভিজ্জ ও পশুমাংসের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে তাহা যে আমরা স্বায়ত্ত করিতে পারি তাহার কারণ, আমাদের নিজের জীবন আছে। আমাদের নিজের প্রাণ না থাকিলে আমরা নূতন প্রাণ উপার্জন করিতে পারি না। আমাদের প্রাণ না থাকিলে উদ্ভিজ্জ পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি অন্য প্রাণীরা আমাদিগকে গ্রহণ করিত। এ জগতে মৃত টিঁকিতে পারে না, জীবিতের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। রামমোহন রায় যদি দেখিতেন আমাদের জীবন নাই, তবে পারসিক মৃতদেহের ন্যায় আমাদিগকে মৃতভবনে ফেলিয়া রাখিতে দিতেন, খৃস্টধর্ম প্রভৃতি অন্যান্য জীবিত প্রাণীর উদরস্থ হইতে দিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি চিকিৎসা শুরু করিয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন— জীবন আমাদের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহাকেই তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। আমাদের চেষ্টা হউক আমাদের এই জীবনকে সতেজ করিয়া তুলি ; তবে আমরা ক্রমে বিদেশীয় সত্য আপনার করিতে পারিব। এইজন্যই বলি প্রাচীন ঋষিদের উপনিষদের ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের দেশে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লই, সার্বভৌমিকতা আপনিই তাহার মধ্যে বিরাজ

করিবে। ঈশ্বর যেমন সকলের ঈশ্বর তেমনি তিনি প্রত্যেকের ঈশ্বর, যেমন তিনি জ্ঞানের ঈশ্বর তেমনি তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর, তিনি যেমন সমস্ত জগতের দেবতা তেমনি আমাদের গৃহদেবতা। তাঁহাকে রাজা বলিয়াও দেখিতে পারি, তাঁহাকে পিতা বলিয়াও দেখিতে পারি। কিন্তু পিতা ঈশ্বর আমাদের যত নিকটের, তিনি আমাদের হৃদয়ের যত অভাব মোচন করেন, এমন রাজা ঈশ্বর নহেন। তেমনি ব্রহ্মাই ভারতবর্ষের সাধনালব্ধ চিরন্তন আশ্রয়; জিহোবা গড্ অথবা আল্লা সেরূপ নহেন। রামমোহন রায় হৃদয়ের উদারতা -বশতই ইহা বুঝিয়াছিলেন।

৫ মাঘ ১২৯১

রামমোহন-প্রসঙ্গ

একদিন যে সময়ে য়ুরোপের জ্ঞানের ঐশ্বর্য হঠাৎ আমাদের চোখের সমুখে খুলিয়া গিয়া আমাদের দেশের নূতন ইংরেজি-শিক্ষিত লোকদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া দিয়াছিল সেই সময়ে রামমোহন রায় আমাদের স্বজাতির পৈতৃক জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার নিতান্ত শিশু ও দুর্বল বাংলাগদ্যেও তিনি উপনিষৎ বেদান্ত প্রভৃতি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সেই ঘোরতর ইংরেজি-বিদ্যাভিমানের দিনে জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের দেশের দারিদ্র্যের লজ্জা দূর করিয়া দিবার জন্য প্রথম দাঁড়াইয়াছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মন হইতে সেই অগৌরব অল্পমাত্রও দূর না হইয়াছিল ততক্ষণ আমরা নিতান্ত নিঃসম্বল ভিক্ষুকের অবস্থায় আমাদের ইংরেজি মাস্টারের মুখের দিকে চাহিয়া অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

কিন্তু কোনো বড়ো জিনিসকে কখনোই ভিক্ষা করিয়া পাওয়া যায় না। নিজের ঘরের মূলধনটি আমরা যতটা পরিমাণে খাটাইব, বাহির হইতেও ততটা পরিমাণে লাভ করিবার অধিকারী হইব। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ এবং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ কথাটার অর্থই তাই। দুই কারণে ভিক্ষুকের দৈন্য ঘোচে না। এক তো পরের নিকট হইতে তাহার উদ্‌বৃত্তের অংশ পাওয়া যায়, কখনোই তাহার ঐশ্বর্য আশা করা যায় না;

দ্বিতীয়ত ভিক্ষুক যতই ভিক্ষা করে ততই তাহার নিজের চেষ্টার প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত চলিয়া যায়। এইজন্য ইংরেজের দেশে সমাজের হিতের প্রতি লক্ষ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তিকে দণ্ডনীয় করা হইয়াছে।

রামমোহন রায় ইহুদি খৃস্টান ও মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ হইতে তাহার সারসংকলন করিয়া স্বদেশীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই-সমস্তকে গ্রহণ ও ধারণ করিবার জন্য লজ্জার সহিত ভিক্ষার পাত্র বাড়াইয়া ধরেন নাই, আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সোনার থাল বাহির করিয়াছিলেন। আমাদের অধিকার যে কোন্‌খানে ছিল তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

এই আমাদের স্বদেশীয় অধিকারের পথেই যাত্রা করিয়া আজ বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনস্বী এবং সেইসঙ্গে আমাদের সমস্ত দেশ, ইস্কুলের ছাত্রভাবকে কাটাইয়া, পৃথিবীর জ্ঞানীসভায় নিজের গৌরবে প্রবেশ করিতেছে। এমনি করিয়া নিজের সম্পদে মাথা তুলিতে পারিলেই আমরা বিশ্বমানবের জ্ঞানশালায় নিঃসংকোচে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারি— নহিলে মুষ্টিভিক্ষা এবং উঞ্ছবৃত্তি করিয়াই দিন কাটাইতে হয়। সম্পদ্‌কে নিজের মধ্যে অনুভব করিলে কেবল যে গৌরববৃদ্ধি হয় তাহা নহে, শক্তিবৃদ্ধি হয়।

পৌষ ? ১৩১৪

২

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন; আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন; আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর, আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খৃস্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে, পৃথিবীর যে দেশেই যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনি আমাদেরই আপন— তাঁহাকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন

রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সংকুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন ; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস, কোনো ক্ষুদ্র অহংকার -বশত মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নাই ; যে অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মতো বহন করিয়াছেন।...

রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ, পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই ; তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন ; এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল ; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলিপূরণ করেন নাই।

শ্রাবণ ১৩১৫

৩

এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আসছে সেই নব-প্রভাতের বার্তা বাংলাদেশে আজ আশি বৎসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংগ্রাম; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লৌহ সিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা। সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীররুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খৃস্টান ধর্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহুপূর্ব যুগে এই বিচিত্র অতিথিদের এক সভায় বসাবার জন্যে আয়োজন হয়ে গেছে। মানবসভ্যতা যখন দেশে দেশে নব নব বিকাশের শাখাপ্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারম্বার মন্ত্র জপ করছিলেন— এক! এক! এক! তিনি বলছিলেন— 'ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি', এই একেকেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়; 'ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ', এই একেকে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্ একের উপলব্ধি-অভাবে। যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌর্বল্য, সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে। যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই একেকে প্রচার করতে।

যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্যে।

মাঘ ১৩১৫

৪

পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এ দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্, সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্বসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

[১৩১৭]

৫

রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে বিশ্বব্যাপী করে প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা, সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু ক'রে

নিভৃতে নির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।

রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনি উচ্চারিত হয়েছে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘরে বাহিরে তখন এই ব্রহ্মসাধনার কথা চাপা ছিল। আমাদের দেশে তখন ব্রহ্মকে পরমজ্ঞানীর অতিদূর গহন জ্ঞানদুর্গের মধ্যে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল; চারি দিকে রাজত্ব করছিল আচার বিচার, বাহ্য অনুষ্ঠান এবং ভক্তিরসমাদকতার বিচিত্র আয়োজন। সেদিন রামমোহন রায় যখন ব্রহ্মসাধনকে পুঁথির অন্ধকারসমাধি থেকে মুক্ত করে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করালেন, তখন দেশের লোক সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল, 'এ আমাদের আপন জিনিস নয়, এ আমাদের বাপ-পিতামহের সামগ্রী নয়।' বলে উঠল, 'এ খৃস্টানি, একে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না।' শক্তি যখন বিলুপ্ত হয়, জীবন যখন সংকীর্ণ হয়ে আসে, জ্ঞান যখন গ্রাম্যগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাল্পনিকতাকে নিয়ে যথেচ্ছ বিশ্বাসের অন্ধকার ঘরে স্বপ্ন দেখে আপনাকে বিফল করতে চায়, তখনি ব্রহ্ম সকলের চেয়ে সুদূর— এমন-কি, সকলের চেয়ে

বিরুদ্ধ হয়ে প্রতিভাত হন। এ দিকে য়ুরোপে মানবশক্তি তখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে বৃহৎভাবে আপনাকে প্রকাশ করছে। কিন্তু, সে তখন আপনাকেই প্রকাশ করতে চাচ্ছে— আপনার চেয়ে বড়োকে নয়, সকলের চেয়ে শ্রেয়কে নয়। তার জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী, তার কর্মের ক্ষেত্র পৃথিবী-জোড়া, এবং সেই উপলক্ষে মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সুদূরবিস্তৃত। কিন্তু তার ধ্বজপতাকায় লেখা ছিল 'আমি', তার মন্ত্র ছিল 'জোর যার মুলুক তার'। সে যে অস্ত্রপাণি রক্তবসনা শক্তি-দেবতাকে জগতে প্রচার করতে চলেছিল, তার বাহন ছিল পণ্যসম্ভার, অন্তহীন উপকরণরাশি।

কিন্তু এই বৃহৎ ব্যাপারকে কিসে ঐক্যদান করতে পারে? এই বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞপতি কে? কেউ-বা বলে স্বাজাত্য, কেউ-বা বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেউ-বা বলে অধিকাংশের সুখ-সাধন, কেউ-বা বলে মানবদেবতা। কিন্তু, কিছুতেই বিরোধ মেটে না, কিছুতেই ঐক্যদান করতে পারে না, প্রতিকূলতা পরস্পরের প্রতি ভ্রূকুটি করে পরস্পরকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করে এবং যাকে গ্রহণ করতে দলবদ্ধ স্বার্থের কোনোখানে বাধে তাকে একেবারে ধ্বংস করবার জন্যে সে উদ্যত হয়ে ওঠে। কেবল বিপ্লবের পর বিপ্লব আসছে, কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলছে, কিন্তু এ কথা একদিন জানতেই হবে— বাহিরে যেখানে বৃহৎ অনুষ্ঠান অন্তরে সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলে কিছুতেই কিছুর সমন্বয় হতে পারবে না;

প্রয়োজনবোধকে যত বড়ো নাম দাও, স্বার্থসিদ্ধিকে যত বড়ো সিংহাসনে বসাও, নিয়মকে যত পাকা করে তোলো এবং শক্তিকে যত প্রবল করে দাঁড় করাও, সত্যপ্রতিষ্ঠা কিছুতেই নেই, শেষ পর্যন্ত কিছুই টিঁকতে এবং টেঁকাতে পারবে না। যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট, সেই আধ্যাত্মিক জীবনসূত্রের দ্বারা না বেঁধে তুলতে পারলে অন্য কোনো কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্মের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না। সেই সম্মিলন যদি না ঘটে তবে আয়োজন যতই বিপুল হবে তার সংঘাতবেদনা ততই দুঃসহ হয়ে উঠতে থাকবে।

১২ মাঘ ১৩১৭

৬

যখন চারি দিক অচেতন, সমস্ত দ্বার রুদ্ধ, সমস্ত দীপ নির্বাপিত, অভাব যখন এতই অধিক যে অভাববোধ চলিয়া গিয়াছে, বাধা যখন এত নিবিড় যে মানুষ তাহাকে আপনার আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিয়া ধরে, সেই সময়েই অভাবনীয়রূপে প্রতিকারের দূত কোথা হইতে দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা বুঝিতেই পারি না। তাহাকে কেহ প্রত্যাশা করে না, কেহ চিনে না, সকলেই তাহাকে শত্রু বলিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠে। এ দেশে একদিন যখন রাশীকৃত প্রাণহীন সংস্কারের বাধা

অনন্তের বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছিল, মানুষের জীবন-যাত্রাকে তুচ্ছ ও সমাজকে শতখণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল, মনুষ্যত্বকে যখন আমরা সংকীর্ণ গ্রাম্যতার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছিলাম, বিশ্বব্যাপারের কোথাও যখন আমরা একের অমোঘ নিয়ম দেখি নাই, কেবল দশের উৎপাতই কল্পনা করিতেছিলাম— উন্মত্তের দুঃস্বপ্নের মতো যখন সমস্ত জগৎকে বিচিত্র বিভীষিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছিলাম এবং কেবলই মন্ত্র-তন্ত্র তাগাতাবিজ শান্তিস্বস্ত্যয়ন মানত ও বলিদানের দ্বারা ভীষণ শত্রুকল্পিত সংসারে কোনোমতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম— এইরূপে যখন চিন্তায় ভীরুতা, কর্মে দৌর্বল্য, ব্যবহারে সংকোচ এবং আচারে মূঢ়তা সমস্ত দেশের পৌরুষকে শতদীর্ণ করিয়া অপমানের রসাতলে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল— সেই সময়ে বাহিরের বিশ্ব হইতে আমাদের জীর্ণ প্রাচীরের উপরে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল— সেই আঘাতে যাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন তাঁহারা এক মুহূর্তেই নিদারুণ বেদনার সহিত বুঝিতে পারিলেন কিসের অভাব এখানে, কিসের এই অন্ধকার এই জড়তা এই অপমান, কিসের এই জীবিত-মৃত্যুর আনন্দহীন সর্বব্যাপী অবসাদ। এখানে আকাশ খণ্ডিত, আলোক নিষিদ্ধ, অনন্তের প্রাণসমীরণ প্রতিহত; এখানে নিখিলের সহিত অবাধ যোগ সহস্র কৃত্রিমতার প্রাচীরে প্রতিরুদ্ধ। তাঁহাদের সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল— ভূমাকে চাই, ভূমাকে চাই!

এই কান্নাই সমস্ত মানুষের কান্না। পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ কোথাও-বা আপনার বহু প্রাচীন অভ্যাসের আবরণের দ্বারা আপনার মঙ্গলকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও-বা সে আপনার নানা রচনার দ্বারা সঞ্চয়ের দ্বারা কেবলই আপনাকে বড়ো করিতে গিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে হারাইয়া ফেলিতেছে। কোথাও-বা সে নিষ্ক্রিয়ভাবে জড়তার দ্বারা কোথাও-বা সে সক্রিয়ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে।

এই বিস্মৃতির গভীর তলদেশ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা, ইহাই আমরা ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসের আরম্ভেই দেখিতে পাই। মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্মের সাধনা রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাইলাম রামমোহন রায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সকল দিকেই তাঁহার চিত্ত পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্মশক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্যই তাহার মূল প্রেরণা নহে— ব্রহ্মের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষকে সকল দিকেই এমন বড়ো করিয়া এমন সত্য করিয়া দেখিয়াছিলেন; সেইজন্যই তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেষ্টন ছাড়াইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিত্তশক্তির বন্ধনমোচন কামনা

করিয়াছিলেন তাহা নহে, মানুষ যেখানেই কোনো মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপনার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড়ো করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন।

১১ পৌষ ১৩১৮

৭

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবায়ুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের ঐক্য তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও মানবের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে হৃদয়ে লইয়া পৃথিবীর ধর্মকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।

তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। তিনি মূর্তিপূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্তিপূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয়

লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধসকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে; যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল; যখন সে বলে আমার এই-সমস্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর-কাহারো প্রবেশ করিয়া ফল নাই এবং কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবই না।

…ধর্মের সংস্কারকে সংকীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃঙ্খলের মতো মানুষকে চাপিয়া ধরে; মানুষের সমস্ত আয়তন যখন বাড়িতেছে তখন সেই ধর্ম আর বাড়ে না, রক্তচলাচলকে বন্ধ করিয়া অঙ্গকে সে কৃশ করিয়াই রাখিয়া দেয়, মৃত্যু পর্যন্ত তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হয়। সেই অতি কঠিন সংকীর্ণ ধর্মের প্রাচীন বন্ধনকে রামমোহন রায় যে কোনোমতেই আপনার আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন নাই তাহার কারণ এই যে, তিনি সহজেই বুঝিয়াছিলেন— যে সত্যের ক্ষুধায় মানুষ ধর্মকে প্রার্থনা করে সে সত্য ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে, তাহা সর্বগত। তিনি বাল্যকাল হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, যে দেবতা সর্বদেশে সর্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন— অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন, অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন— যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন, অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন— তিনি আমারও দেবতা হইতে

পারেন না, কারণ সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোখানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণ সত্য হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্মের সত্য।

১১ মাঘ ১৩১৮

৮

আমাদের দেশে বর্তমানকালে, কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব তাহা লইয়া অন্তত ব্রাহ্মসমাজে একটা তর্ক উঠিয়াছে। অথচ এ তর্কটা রামমোহন রায়ের মনের মধ্যে একেবারেই ছিল না দেখিতে পাই। এ দিকে তিনি সমাজপ্রচলিত বিশ্বাস ও পূজার্চনা ছাড়িয়াছেন, কোরান পড়িতেছেন, বাইবেল হইতে সত্যধর্মের সারসংগ্রহ করিতেছেন, অ্যাডাম সাহেবকে দলে টানিয়া ব্রাহ্মসভা স্থাপন করিয়াছেন— সমাজে নিন্দায় কান পাতিবার জো নাই, তাঁহাকে সকলেই বিধর্মী বলিয়া গালি দিতেছে, এমন-কি, যদি কোনো নিরাপদ সুযোগ মিলিত তবে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে এমন লোকের অভাব ছিল না— কিন্তু, কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোনোদিন লেশমাত্র সংশয় ওঠে নাই। কারণ হাজার হাজার লোকে তাঁহাকে অহিন্দু বলিলেও তিনি হিন্দু এ সত্য যখন লোপ পাইবার নয়, তখন এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করিবার কোনো দরকার ছিল না।

…রামমোহন রায় তাঁহার চারি দিকের বর্তমান অবস্থা

হইতে যত উচ্চেই উঠিয়াছেন, সমস্ত হিন্দুসমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন। এ কথা কোনোমতেই বলিতে পারিব না যে তিনি হিন্দু নহেন, কেননা অন্যান্য অনেক হিন্দু তাঁহার চেয়ে অনেক নীচে ছিল এবং নীচে থাকিয়া তাঁহাকে গালি পাড়িয়াছে। কেন বলিতে পারিব না? কেননা, এ কথা সত্য নহে। কেননা, তিনি যে নিশ্চিতই হিন্দু ছিলেন, অতএব তাঁহার মহত্ত্ব হইতে কখনোই হিন্দুসমাজ বঞ্চিত হইতে পারিবে না— হিন্দুসমাজের বহুশত লক্ষ লোক যদি এক হইয়া স্বয়ং এজন্য বিধাতার কাছে দরখাস্ত করে তথাপি পারিবে না। শেক্‌স্‌পিয়র-নিউটনের প্রতিভা অসাধারণ হইলেও তাহা যেমন সাধারণ ইংরেজের সামগ্রী, তেমনি রামমোহনের মত যদি সত্য হয় তবে তাহা সাধারণ হিন্দুসমাজেরই সত্য মত।

অতএব, যদি সমস্ত বিপুল হিন্দুসমাজের মধ্যে কেবল-মাত্র আমার সম্প্রদায়ই সত্যধর্মকে পালন করিতেছে ইহাই সত্য হয়, তবে এই সম্প্রদায়কেই আশ্রয় করিয়া সমস্ত হিন্দু-সমাজ সত্যকে রক্ষা করিতেছে— তবে অপরিসীম অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র এই পূর্বপ্রান্তে সমস্ত সমাজেরই অরুণোদয় হইয়াছে। আমি সেই রাত্রির অন্ধকার হইতে অরুণোদয়কে ভিন্ন কোঠায় স্বতন্ত্র করিয়া রাখিব না। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দুসমাজেরই নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মান্তিক প্রয়োজনবোধের ভিতর দিয়া তাহারই

আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্‌বোধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে। যেখানে তাহার উদ্ভব সেখানকার সমগ্রের সহিত তাহার গভীরতম জীবনের যোগ আছে। বীজকে বিদীর্ণ করিয়া গাছ বাহির হয় বলিয়াই সে গাছ বীজের পক্ষে একটা বিরুদ্ধ উৎপাত নহে। হিন্দুসমাজের বহুস্তরবদ্ধ কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজে ব্রাহ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বলিয়া তাহা হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধ নহে, ভিতর হইতে যে অন্তর্যামী কাজ করিতেছেন তিনি জানেন তাহা হিন্দু-সমাজেরই পরিণাম।

বৈশাখ ১৩১৯

৯

ভারতের সেই আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধের সাধনা আজিকার দিনেও নিশ্চেষ্ট হয় নাই। তাই এ কথা জোর করিয়া বলা যায় যে, রামমোহন রায়ের জন্ম এবং তাঁহার তপস্যা আধুনিক ভারতের সকল ঘটনার মধ্যে বড়ো ঘটনা; কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম আপন অবিচ্ছিন্নতা অনুভব করিবে, আজ পৃথিবীতে ইহার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। পশ্চিম যখন ভারতের দ্বারে আঘাত করিল তখন ভারত সর্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়াই সেই আঘাতের সত্যকার সাড়া দিয়াছিল। তিনি ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই, অর্থাৎ

পরমাত্মায় সকল আত্মার ঐক্য এই বিশ্বাসের মধ্যেই, সর্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

[পৌষ] ১৩২৪

১০

...একজনের নাম আজ আমার মনে পড়ছে— যিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভাবী কালের, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্মিলনের সাধনা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও বিদ্যাসাগরের মতো জীবনের আরম্ভকালে শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখেন নি। তিনি দীর্ঘকাল কেবল প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাকেই একমাত্র শিক্ষার বিষয় করেছিলেন। কিন্তু, তিনি এই সীমার মধ্যেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারলেন না। রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, নানা ধর্মে অনুসন্ধান করেছিলেন— এই নির্ভীক সাহসের জন্য তিনি ধন্য। যেমন ভৌগোলিক সত্যকে পূর্ণভাবে জানবার জন্য মানুষ নূতন নূতন দেশে নিষ্ক্রমণ ক'রে অসাধারণ অধ্যবসায় ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে, তেমনি মানসলোকের সত্যের সন্ধানে চিত্তকে প্রথার আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে নব নব পথে ধাবিত করতে গিয়ে মহাপুরুষেরা আপন চরিত্রমহিমায় দুঃসহ কষ্টকে শিরোধার্য করে নিয়ে থাকেন।

১৭ শ্রাবণ ১৩২৯

১১

ভারতের বাণী বহন করে যে-সকল একের দূত এ দেশে জন্মেছেন তাঁরা যে প্রথম হতেই এখানে আদর পেয়েছেন তা নয়।··· আদর না পাওয়াই স্বাভাবিক, কেননা তাঁরা ভেদ-প্রবর্তক সনাতনবিধির বাহিরের লোক, যেমন খৃস্ট ছিলেন ইহুদি ফ্যারিসি-গণ্ডির বাহিরে। কিন্তু, বহুদিন তাঁরা অনাদরের অসাম্প্রদায়িক ছায়ায় প্রচ্ছন্ন ছিলেন বলে তাঁরাই যে অভারতীয় ছিলেন তা নয়। তাঁরাই ছিলেন যথার্থ ভারতীয়, কেননা তাঁরাই বাহিরের কোনো সুবিধা থেকে নয়, অন্তরের আত্মীয়তা থেকে, হিন্দুকে মুসলমানকে এক করে জেনে-ছিলেন ; তাঁরাই ঋষিদের সেই বাক্যকে সাধনার মধ্যে প্রমাণ করেছিলেন যে বাক্য বলে— সত্যকে তিনিই জানেন যিনি আপনাকেই জানেন সকলের মধ্যে।

ভারতীয় এই সাধকদেরই সাধনাধারা বর্তমান কালে প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন রায়ের জীবনে। এই যুগে তিনিই উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দু মুসলমান খৃস্টানকে সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জন করেন নি। বুদ্ধির মহিমায় ও হৃদয়ের বিপুলতায় তিনি এই বাহ্যভেদের ভারতে আধ্যাত্মিক অভেদকে উজ্জ্বল করে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই অভেদকে প্রচার করতে গিয়ে দেশের লোকের কাছে আজও তিনি তিরস্কৃত। যাঁর নির্মল দৃষ্টির কাছে হিন্দু মুসলমান

খৃস্টানের শাস্ত্র আপন দুরূহ বাধা সরিয়ে দিয়েছিল, তাঁকে আজ তারাই অভারতীয় বলতে স্পর্ধা করছে পাশ্চাত্য বিদ্যা ছাড়া আর কোনো বিদ্যায় যাদের অভিনিবেশ নেই। আজকের দিনেও রামমোহন রায় আমাদের দেশে যে জন্মেছেন তাতে এই বুঝতে পারি যে, কবীর নানক দাদূ ভারতের যে সত্য-সাধনাকে বহন করেছিলেন আজও সেই সাধনার প্রবাহ আমাদের প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নি। ভারতচিত্তের প্রকাশের পথ উদ্‌ঘাটিত হবেই।

ভাদ্র ১৩৩৫

Rammohun Roy

Rammohun Roy inaugurated the Modern Age in India. He was born at a time when our country, having lost its link with the inmost truths of its being, struggled under a crushing load of unreason, in abject slavery to circumstance. In social usage, in politics, in the realm of religion and art, we had entered the zone of uncreative habit, of decadent tradition, and ceased to exercise our humanity. In this dark gloom of India's degeneration Rammohun rose up, a luminous star in the firmament of India's history, with prophetic purity of vision, and unconquerable heroism of soul. He shed radiance all over the land ; he rescued us from the penury of self-oblivion. Through the dynamic power of his personality, his uncompromising freedom of the spirit, he vitalized our national being with the urgency of creative endeavour, and launched it into the arduous adventure of realization. He is the great path-maker of this century who has removed ponderous obstacles that impeded our progress at every step, and initiated us into the present Era of world-wide co-operation of humanity.

Rammohun belongs to the lineage of India's great seers who age after age have appeared in the arena of our history with the message of Eternal Man. India's special genius has been to acknowledge the divine in human affairs, to offer hospitality to all that is imperishable in human civilization, regardless of racial and national divergence. From the early dawn of our history it has been India's privilege and also its problem, as a host, to harmonize the diverse elements of humanity which have inevitably been brought to our midst, to synthetize contrasting cultures in the light of a comprehensive ideal. The stupendous structure of our social system with its intricate arrangement of caste testifies to the vigorous attempt made at an early stage of human civilization to deal with the complexity of our problem; to relegate to every class of our peoples however wide the cleavage between their levels of culture, a place in a cosmopolitan scheme of society. Rammohun's predecessors, Kabir, Nanak, Dadu, and innumerable saints and seers of medieval India, carried on much further India's great attempt to evolve a human adjustment of peoples and races; they broke through barriers

of social and religious exclusiveness and brought together India's different communities on the genuine basis of spiritual reality. Now that our outworn social usages are yielding rapidly to the stress of an urgent call of unity, when rigid enclosures of caste and creed can no more obstruct the freedom of our fellowship, when India's spiritual need of faith and concord between her different peoples has become imperative and seems to have aroused a new stir of consciousness throughout the land, we must not forget that this emancipation of our manhood has been made possible by the indomitable personality of the great Unifier, Rammohun Roy. He paved the path for this reassertion of India's inmost truth of being, her belief in the equality of man in the love of the Supreme Person, who ever dwells in the hearts of all men and unites us in the bond of welfare.

Rammohun was the only person in his time, in the whole world of man, to realize completely the significance of the Modern Age. He knew that the ideal of human civilization does not lie in the isolation of independence, but in the brotherhood of interdependence of individuals as well as of nations in all spheres of thought

and activity. He applied this principle of humanity with his extra-ordinary depth of scholarship and natural gift of intuition, to social, literary and religious affairs, never acknowledging limitations of circumstance, never deviating from his purpose lured by distractions of temporal excitement. His attempt was to establish our peoples on the full consciousness of their own cultural personality, to make them, comprehend the reality of all that was unique and indestructible in their civilization, and simultaneously, to make them approach other civilization in the spirit of sympathetic co-operation. With this view in his mind he tackled an amazingly wide range of social, cultural and religious problems of our country, and through a long life spent in unflagging service to the cause of India's cultural reassertion, brought back the pure stream of India's philosophy to the futility of our immobile and unproductive national existence. In social ethics he was an uncompromising interpreter of the truths of human relationship, tireless in his crusade against social wrongs and superstition, generous in his co-operation with any reformer, both of this country and of outside, who came

to our aid in a genuine spirit of comradeship. Unsparingly he devoted himself to the task of rescuing from the debris of India's decadence the true products of its civilization, and to make our people build on them, as the basis, the superstructure of an international culture. Deeply versed in Sanskrit, he revived classical studies, and while he imbued the Bengali literature and language with the rich atmosphere of our classical period, he opened its doors wide to the spirit of the Age, offering access to new words from other languages, and to new ideas. To every sphere of our national existence he brought the sagacity of a comprehensive vision, the spirit of self-manifestation of the unique in the light of the universal.

Let me hope that in celebrating his Centenary we shall take upon ourselves the task of revealing to our own and contemporaneous civilizations the multisided and perfectly balanced personality of this great man. We in this country, however, owe a special responsibility, not only of bringing to light his varied contributions to the Modern Age, but of proving our right of kinship with him by justifying his life, by maintaining in every realm of our national

existence the high standard of truth which he set before us. Great men have been claimed by humanity by its persecution of them and wilful neglect. We evade our responsibility for those who are immeasurably superior to us by repudiating them. Rammohun suffered martyrdom in his time and paid the price of his greatness. But out of his sufferings, his power of transmuting them to carry on further beneficent activities for the good of humanity, the Monern age has gained an undying urge of life. If we fail him again in this day of our nation-building, if we do not observe perfect equity of human relationship offering uncompromising fight to all forms and conventions, however ancient they may be in usage, which separate man and man, we shall be pitiful in our failure and shamed for ever in the history of man. Our futility will be in the measure of the greatness of Rammohun Roy.

18 February 1933

গ্রন্থপরিচয়

'যিনি আমার পরমপূজনীয়[১], যাঁর কাছ থেকে আমার জীবনের পূজা আমার সমস্ত জীবনের সাধনা আমি গ্রহণ করেছি', সেই রামমোহনের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ যৌবনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আমৃত্যু জীবনের বিভিন্ন পর্বে শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া গিয়াছেন। 'ভারতপথিক রামমোহন' গ্রন্থে এই শ্রদ্ধার্ঘ্যসম্ভার যথাসাধ্য সংকলিত হইয়াছে।

রামমোহন-মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই গ্রন্থের প্রথম প্রচার, এবং রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকীর প্রাক্‌কালে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত বহু রচনা -সংবলিত ইহার নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহাশয় এই নূতন সংস্করণের সংকলন এবং আনুপূর্বিক সম্পাদনা করিয়াছেন।

কবিতা

প্রবেশক। 'নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে'। ১৩৪৭ ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত '১১ই মাঘ' প্রবন্ধের (এই গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধ) অনুবৃত্তিরূপে 'চিরস্মরণীয়' নামে প্রকাশিত। সম্ভবত দুইটি রচনাই প্রায় একই কালে লিখিত। কবিতাটি পরে 'জন্মদিনে' (১ বৈশাখ ১৩৪৮) গ্রন্থে সংকলিত।

'হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার'। রামমোহন-মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্রসমাজ যে স্মারকগ্রন্থ (The Students' Rammohun Centenary Volume, Calcutta, 1934) প্রকাশ করেন, তাহাতে প্রথম প্রকাশিত।

১ 'Who is your hero or heroine in life' এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এক "Confession Book"এ লিখিয়াছিলেন : রামমোহন রায়। ১৩৬০ বৈশাখ সংখ্যা পরিচয় পত্রে এই প্রশ্নোত্তর মুদ্রিত হইয়াছে।

*†১. রামমোহন-মৃত্যু-শতবার্ষিক উৎসবে (২৯ ডিসেম্বর ১৯৩৩। ১৪ পৌষ ১৩৪০ পঠিত সভাপতির অভিভাষণ। উৎসবানুষ্ঠানে ইহা পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়।

†২. শতবার্ষিক-উৎসবের সমাপ্তিদিবসে (৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৩) কথিত অভিভাষণ। 'রামমোহন রায়' নামে ১৩৪০ ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত।

৩. ১৩৪৭ ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে '১১ই মাঘ' নামে প্রকাশিত।

৪. ১৩৪৩ ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে 'রামমোহন রায়' নামে প্রকাশিত। ১৩৪৩ সালের ১০ আশ্বিন তারিখে শান্তিনিকেতনে রামমোহন-স্মৃতিবাসরে কথিত। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত -কর্তৃক অনুলিখিত; এই অনুলিপি বক্তা সংশোধন করিয়া দেন।

৫. ১৩৪৩ বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে 'মাঘোৎসব ১' নামে প্রকাশিত। শান্তিনিকেতনে মাঘোৎসবে (১৩৪২) আচার্যের উদ্‌বোধন। শ্রীক্ষিতীশ রায় -কর্তৃক অনুলিখিত।

৬. ১৩৩৫ চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে 'রামমোহন রায়' নামে প্রকাশিত। 'শান্তিনিকেতনে মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্যাখ্যাত'।

৭. ১৩৩৫ সালে ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিক উৎসবে ৬ ভাদ্র প্রাতঃকালে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত অংশ তাহার মৌখিক ভূমিকা; প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ -কর্তৃক অনুলিখিত। 'রুদ্রের আহ্বান ও আশীর্বাদ' নামে ১৩৩৫ আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত। পরবর্তী অংশ, অর্থাৎ লিখিত অভিভাষণ, *'রামমোহন রায়' নামে ১৩৩৫ আশ্বিন সংখ্যা

প্রবাসীতেই মুদ্রিত হয়। ইহার ইংরেজি অনুবাদ Ram Mohun Roy নামে ১৯২৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যা Modern Review পত্রে প্রকাশিত হয়। পূর্বোক্ত THE STUDENTS' RAMMOHUN CENTENARY VOLUME (1934) গ্রন্থে এই অনুবাদের একটি পরিমার্জিত রূপ মুদ্রিত হইয়াছিল।

*৮. কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরি গৃহে রামমোহন-স্মরণ-সভায় সভাপতির অভিভাষণ, ১৩২২। এই বক্তৃতার মর্ম সঞ্জীবনী হইতে ১৩২২ কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগে 'নব্য ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায়' প্রসঙ্গে পুনর্মুদ্রিত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কার্তিক ১৮৩৭ শক সংখ্যাতেও পুনর্মুদ্রিত।

৯. ১৩৩৩ কার্তিক সংখ্যা ভারতী পত্রে মুদ্রিত। ১৩৫৩ সনের তত্ত্বকৌমুদী পত্রে ১৬ ভাদ্র ও ১ আশ্বিন সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

*১০. মাঘ ১২৯১ সংখ্যা ভারতী ও ১৮০৬ শকের চৈত্র সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত। পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত (মার্চ ১৮৮৫)। পুস্তিকার মলাটে এই বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত আছে— 'রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় ১২৯১ সালের ৫ মাঘে সিটি কলেজ গৃহে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -কর্তৃক এই প্রবন্ধটি পঠিত হয়।'

গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত আছে— 'রামমোহন রায়ের মতের উদারতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অনেকে ভুল বুঝিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম-সম্বন্ধীয় মত যে অত্যন্ত উদার ছিল তাহা লেখক স্বীকারই করিয়াছেন। তাঁহার ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা প্রতিবাদকারিগণ পুনর্বার মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন।'

চারিত্রপূজা (১৯০৭) গ্রন্থে এই প্রবন্ধের একটি পরিমার্জিত পাঠ প্রকাশিত হয়; বর্তমান গ্রন্থেও তাহাই সংকলিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত।

কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরিতে ১১ আশ্বিন ১৩২৪ (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৭) রামমোহন-স্মরণ-সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও 'একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। দুঃখের বিষয় এই সুন্দর বক্তৃতাটি কেহ লিখিয়া লন নাই।' তত্ত্বকৌমুদী ও সঞ্জীবনীতে এই বক্তৃতার যে তাৎপর্য প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩২৪ কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগে 'রাজা রামমোহন রায়' শীর্ষক প্রসঙ্গে তাহা সংকলিত আছে। সঞ্জীবনীতে-প্রকাশিত তাৎপর্য প্রবাসী হইতে নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল—

'শিশু মায়ের কোলে বাড়িতে থাকে। প্রত্যেক জাতি তেমনি আপন আপন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাড়িয়া থাকে। এইরূপ বৃদ্ধি ও পরিণতির প্রয়োজন আছে। এক সময়ে পৃথিবীর সকল জাতি এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে বাড়িয়াছে। কিন্তু এই বৃদ্ধিই চরম বৃদ্ধি নহে। সকল জাতিকেই বিশ্বের মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য জোগাইতে হইবে।

'আপনারা শুনিয়াছেন যে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে রামমোহন জন্মলাভ করেন। ঐ বিপ্লবের যুগে যে বিশ্ববাণী ধ্বনিত হইতেছিল তাহা কেমন করিয়া শিশু রামমোহনের প্রাণ স্পর্শ করে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

'উষার অরুণরশ্মি যেমন উচ্চ শিখরগুলিকে আলোকমণ্ডিত করে, তেমনি সেই যুগে পৃথিবীর কতিপয় মহাত্মা বিশ্ববোধের আলোক

লাভ করিয়াছিলেন। শিখরে যখন প্রথম আলোকসম্পাত হয় তখন নিম্নভূমি গভীর অন্ধকারে আবৃত থাকে। বঙ্গভূমি যখন নানা কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন তখন বালক রামমোহন অলৌকিক রূপে বিশ্ববোধের আলোক লাভ করিয়াছিলেন। এই জ্ঞানলাভের পক্ষে দেশ অনুকূল ছিল না, বরং সমস্তই তাঁহার প্রতিকূলে ছিল। তিনি যেন দৈবশক্তিবলে এই জ্ঞান লাভ করিলেন।

'বঙ্গদেশের এক অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি যে কেমন করিয়া বিশ্ববোধ লাভ করিলেন তাহা বিস্ময়কর। তিনিই এই দেশে তখন ভূমার বাণী ঘোষণা করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

'সেই অন্ধকারের পরপারের মহান্ পুরুষকে তিনি জানিয়াছিলেন। অন্ধকারের পরপার হইতে জ্যোতির্ময় পুরুষের আলোক আসিয়া এই শিখরের উপর পতিত হইয়াছিল।

'পৃথিবীর কোনো জাতি এখন আপনার সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারিবে না। উহাতে যে হীন দেশাত্মবোধ জাগাইয়া থাকে তাহা হইতেই হানাহানি-মারামারির সৃষ্টি হয়। এখন প্রত্যেক দেশকে আপন গৃহবাতায়ন খুলিয়া দিয়া বিশ্বকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। ছোটো হইয়া থাকায় সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ।

ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।

'পৃথিবীর কোনো জাতি হীনতার মধ্যে চিরকাল থাকিবে না। বাঙালির নিরাশার কারণ নাই। বাঙালির গৃহে রামমোহন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙালির ভবিষ্যৎ গৌরব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যাঁহারা মহৎ তাঁহারা অগৌরবের মধ্যে গৌরবকে, ক্ষুদ্রের মধ্যে

বৃহৎকে প্রত্যক্ষ করেন। এখন পৃথিবীতে যে রণকোলাহল চলিতেছে ইহারই মধ্যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা জাতিসমূহের ভবিষ্যৎ ভ্রাতৃসংঘের ছবি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তখন জাতিতে জাতিতে কিরূপ মৈত্রী স্থাপিত হইবে তাহার আলোচনা চলিতেছে।

'বঙ্গের ভবিষ্যৎ গৌরব তখনকার গভীর অন্ধকারের মধ্যেই রামমোহন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি বাঙালিকে বিশ্বের রাজপথ দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙালির কোনো নিরাশার কোনো আশঙ্কার কারণ নাই, বাঙালি বৃহৎ মনুষ্যত্বের পথে যাত্রা করিয়াছেন।'

রামমোহন-প্রসঙ্গ

বিভিন্ন প্রবন্ধে ও ভাষণে রামমোহন-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে-সব উক্তি পাওয়া যায় তাহারই সংকলন। নিম্নে মূল রচনা ও যে-সকল গ্রন্থ বা পত্রিকা হইতে সেগুলি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার নির্দেশ দেওয়া গেল।

শক্তি। বঙ্গদর্শন : মাঘ ১৩১৪
*পূর্ব ও পশ্চিম। সমাজ
*নবযুগের উৎসব। শান্তিনিকেতন
*সামঞ্জস্য। শান্তিনিকেতন
*ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা। শান্তিনিকেতন
*ধর্মশিক্ষা। সঞ্চয়
*ধর্মের নবযুগ। সঞ্চয়
*আত্মপরিচয়। পরিচয়
স্বাধিকারপ্রমত্তঃ। কালান্তর
বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরচরিত
মরমিয়া। প্রবাসী : ভাদ্র ১৩৩২

*Rammohun Roy। রামমোহন-মৃত্যু-শতবার্ষিক অনুষ্ঠানের কলিকাতা সেনেট হাউসে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ তারিখে উদ্‌যোগ-সভায় (Preliminary Meeting) সভাপতির অভিভাষণ। ইহা পুস্তিকাকারে সভাস্থলে বিতরিত হয়। রামমোহন-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত, শ্রীঅমল হোম -সম্পাদিত RAMMOHUN ROY/THE MAN AND HIS WORK/ -নামক গ্রন্থে এই প্রবন্ধ ('Inaugurator of the Modern Age in India') পুনর্মুদ্রিত (ইহা পরে রামমোহন-শতবার্ষিক উৎসবের স্মারক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী -সম্পাদিত THE FATHER OF MODERN INDIA পুস্তকের অন্তর্গত) এবং ১৯৫৬ সেপ্টেম্বরে রামমোহনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ -কর্তৃক পুনরায় পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়।

*চিহ্নিত রচনাগুলি 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' পুস্তকের প্রথম প্রকাশ-কালে গ্রন্থভুক্ত হয়। †চিহ্নিত রচনা দুইটি বর্তমানে চারিত্রপূজা গ্রন্থের (১৩৪৩ ও পরবর্তী সংস্করণ) অন্তর্গত। এই দুইটি রচনা THE FATHER OF MODERN INDIA গ্রন্থেও মুদ্রিত হইয়াছিল। কবিতা দুইটি ও ইংরেজি রচনাটির বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর রচনাগুলি 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' গ্রন্থের বর্তমান রবীন্দ্র-শতবার্ষিক সংস্করণে প্রথম সংকলিত। সংকলনকার্যে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশেষ সহায়তা পাওয়া গিয়াছে।

সংকলিত রচনার শেষে, রামমোহন-স্মরণ-সভা, ভাদ্রোৎসব, মাঘোৎসব প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠানে অভিভাষণের তারিখ, তদভাবে

রচনার মাস ও সাল, দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাস-নির্দেশ অনুমাননির্ভর।

চিত্র

রামমোহনের চিত্রখানি James Cowles Prichard -রচিত RESEARCHES INTO THE PHYSICAL HISTORY OF MANKIND (তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮৪১) গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

জন্মকাল

রামমোহনের জন্ম-সাল ১৭৭৪ বা ১৭৭২ খৃস্টাব্দ এ বিষয়ে মতভেদ আছে —সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ষোড়শ গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৭৪ সনের অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

—